সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো

সুব্রত বড়ুয়া

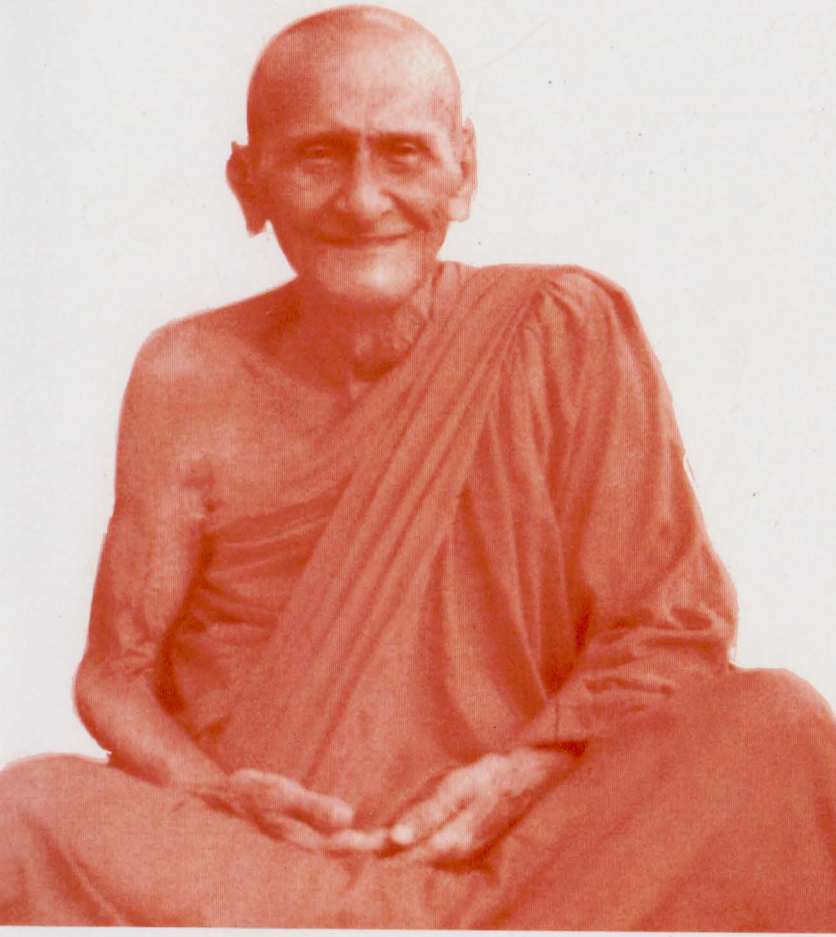

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvabito Bhante

সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো

(১৯০০-২০০০)

সুব্রত বড়ুয়া

মহামান্য সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহথেরো'র
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে (১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ২০০১)
স্বর্গত পিতা অন্নদা চরণ বড়ুয়া ও মাতা সরোজিনী বড়ুয়ার
পুণ্যস্মৃতি স্মরণে
সমর কান্তি বড়ুয়া
(গ্রাম-ছিলোনীয়া, থানা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম)
কর্তৃক প্রকাশিত।

সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো

সুব্রত বড়ুয়া

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপনা
ইত্যাদি
৮/৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা
ঢাকা-১২০৫

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

Sangharaj Shilalankar Mahathero by Subrata Barua. Published by Samar Kanti Barua, Vill.-Silonia, PS.-Fatickchari, Dist.-Chittagong. Price : Tk. 40.00 Only

নিবেদন

জীবনী রচনা একটি দুরূহ কাজ। যে কোনো জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ শ্রম ও মেধা। শ্রদ্ধাভাজন সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহথেরোর জীবনী রচনার কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে—এই স্বল্প সময়ে তাঁর মতো মহৎজীবনের উপযুক্ত জীবনী রচনা সম্ভব নয়। এজন্য আরো অনেক বেশি সময় ও সুপরিকল্পিত কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন। বর্তমান জীবনীটি অতি স্বল্প পরিসরে রচিত। হাতের কাছে যেসব বই ও পত্র-পত্রিকা পেয়েছি, সেগুলোর সাহায্য নিয়েই এটি রচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে ঋণও স্বীকার করেছি। ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি সময় নিয়ে সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরোর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনার সূচনা-প্রয়াস হিসেবেই আমার এ কাজ। বলা যায়, এ কাজটি কেবল এই মুহূর্তে প্রয়াত সংঘরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মাত্র।

তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। আশা করি, ভবিষ্যতে তা সংশোধন করা সম্ভব হবে। এ বইটি লেখার ব্যাপারে 'জ্যোতি'র পরিচালনা সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমান বড়ুয়া আমাকে পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। জগতের সকল প্রাণ সুখী হোক।

১২ জানুয়ারি, ২০০১ সুব্রত বড়ুয়া

ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিত

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে তথাগত গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার এবং ক্রমে সমগ্র উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও সমৃদ্ধির পর কেন পরবর্তীকালে উপমহাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়ে কেবল দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তা টিকে রয়েছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা অনেকের। বিশেষত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাসই শুধু নয়, তার চেয়েও অধিক যা লক্ষণীয় তা হলো এ অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রভাব। জনসংখ্যার দিক থেকে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা মুসলমান ও হিন্দু এ দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক কম হলেও চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিষয়টি বিবেচনার সকল ক্ষেত্রেই চট্টগ্রাম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। তাই সচেতন মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই উপর্যুক্ত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। এক কথায় এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান দুরূহ। কোনো একটি একক কারণও বোধ হয় এ পরিণতির জন্য নির্দেশ করা যায় না। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের জটিল এ গ্রন্থি উন্মোচনের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, এ গ্রন্থি উন্মোচনের কাজে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন সময়ে এবং এখনও অনেকে এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু নেই। নতুন উপাদান নতুন বিবেচনার দিকে দৃষ্টি ফেরায়। নতুন ভাবনার দিকে গবেষককে চালিত করে। এ রচনায় আমরা নতুন কোনো গবেষণা-প্রয়াসে ব্রতী হইনি। সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরোর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট হিসেবেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের কালপরম্পরাগত চিত্রবিন্যাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

কার্যকারণ ব্যতীত কোনো ঘটনাই সংঘটিত হয় না। তবে কার্যকারণের সঠিক সূত্র নির্ধারণের কাজটি মোটেও সহজ নয়। উৎপত্তিস্থল ও প্রসারকেন্দ্র থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি প্রসঙ্গে যে-সব কারণ বিভিন্ন গবেষক চিহ্নিত করেছেন তা হলো : তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ সংঘে মতের বিভিন্নতা ও অন্তর্কলহ, সংঘের বাইরে লোকসমাজে প্রথম থেকে নির্দিষ্ট বৌদ্ধ গৃহীসমাজের অনুপস্থিতি, রাজশক্তির আনুকূল্য বর্জন, সামাজিক শক্তিসমূহের কাছ থেকে যথাযোগ্য সমর্থন লাভে ব্যর্থতা, ধর্ম-বিনয়ের ক্ষেত্রে অপশক্তির অনুপ্রবেশ, হিন্দু ধর্মীয় শক্তিসমূহের প্রতিকূল আক্রমণ, বহিরাগত আক্রমণকারীদের আক্রমণে বৌদ্ধধর্মীয় কেন্দ্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং প্রতিকূল রাষ্ট্রশক্তি ও সামাজিক শক্তির বিরোধিতার মুখে বৌদ্ধদের স্থানান্তরে গমন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসমাজের সূচনা কখন থেকে সে বিষয়টি নির্ধারণ করা সহজ নয়, কেননা ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচার শুরুর পর থেকেই বৌদ্ধ জনসমাজ সৃষ্টি হয়নি। সম্ভবত সেকালে জনসমাজের এরূপ বিভক্তির তেমন কোনো প্রবল কারণও ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের মানুষই সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং সংঘে এরূপ অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধাচারণও ঘটেনি। কিন্তু সাধারণ গৃহীসমাজে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের পর পরই যে বর্ণাশ্রম প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল কিংবা বুদ্ধের বর্ণাশ্রমবিরোধী মতবাদ নির্বিচারে ও নির্বিরোধে গৃহীত হয়েছিল তা নয়। তাছাড়া তথাগত বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যেও সবাই যে তাঁর প্রচারিত বৈপ্লবিক ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত মর্মবাণী জাগতিক কর্ম ও আচরণ এবং মানসিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় সর্বাংশে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। বহুদিনের ও বহুযুগের সংস্কার পরিত্যাগ করা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই কঠিন। এই সংস্কার পরবর্তীকালে পুনরায় প্রবল হয়ে উঠেছিল বলেই মনে হয় এবং জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ বৃহত্তর হিন্দু সমাজেই প্রত্যাবর্তন করেছিল বলে ধারণা করা যায়। পক্ষান্তরে যারা বুদ্ধের ধর্মমতের অনুসারী হিসেবেই নিজেদের ধর্মজীবন ও সমাজ-জীবন রক্ষা করেছিল তাদের আচার-আচরণ ও জাগতিক কর্মকাণ্ডে আনুষ্ঠানিকতা ও উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে অ-বৌদ্ধ উপাদানসমূহ অনুপ্রবেশ করেছিল স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন উপাদান হিসেবে। বুদ্ধের জীবনকালেই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কেউ কেউ ঈর্ষা ও অহমিকাবশত বুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন; যেমন দেবদত্ত বহুসংখ্যক ভিক্ষু নিয়ে বুদ্ধের

বিরোধিতা ও পরে পৃথক ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরূপ প্রধান বিরোধিতা ছাড়াও ভিক্ষুসংঘ ও গৃহীদের আচরণীয় নানা বিষয় নিয়ে অস্পষ্টতা ও বিরোধ দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* গ্রন্থে 'ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও ইহার পরিণতি' নিবন্ধে লিখেছেন :

> বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইমাস পরে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম সংগীতিতে ধর্ম-বিনয় ত্রিপিটক হিসাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। উহার একশত বৎসরের মধ্যে বর্জিপুত্র ভিক্ষুগণ দশটি বিবাদাস্পদ বিষয় সংঘের মধ্যে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। উহার নিরসনকল্পে বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্তী একশত বিশ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম স্থবিরবাদ ও মহাসাংঘিক এই দুইভাবে বিভক্ত হয়। রক্ষণশীল স্থবিরবাদীরা বুদ্ধকে মহামানবরূপে রাখিতে চাহেন। মহাসাংঘিকরা বুদ্ধের মধ্যে অলৌকিক ও অমানবরূপ আরোপ করিতে থাকেন। ইহার ফলস্বরূপ বুদ্ধের ধর্ম ক্রমে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৫৩ অব্দে সম্রাট অশোকের প্রেরণায় তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন হয়। উহাতে স্থবিরবাদ মতই সর্বসম্মতভাবে বুদ্ধবাণীরূপে স্বীকৃত হয় এবং তাহা ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরিত হয়। মহাসাংঘিকেরা ইহাতে উপেক্ষিত হইলেও হাল ছাড়িলেন না। ইহার সাড়ে তিনশত বৎসর পর কুষাণরাজ কণিষ্কের (৭৮ খৃষ্টাব্দে) সময় মহাসাংঘিকদের উদ্যোগে ভারতে চতুর্থ সংগীতির অধিবেশন হয়। এই সময় মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ত্রিপিটক লিখিত হয়। তারপর মহাসাংঘিকদের রূপান্তরিত নাম হয় সর্বাস্তিবাদ। খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত পূর্বের অষ্টাদশ শাখার জের চলিলেও মহাযান মত তখন ভিতরে ভিতরে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। ক্রমে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের পণ্ডিতগণ সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক গ্রন্থ রচিত হইল। নাগার্জুন, আর্যদেব, দিঙ্‌নাগ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বহু উন্নত বৌদ্ধ মতবাদ ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারিত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে নিজেদের নাম রাখেন মহাযান এবং অপর দুই সম্প্রদায়কে তাঁহারা হীনযান আখ্যা প্রদান করেন। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায় দার্শনিক চিন্তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। তৎপর উহার বিপর্যয়ের সূচনা হয়।
>
> খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে বিশেষত

বঙ্গদেশে মহাযান হইতে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের তান্ত্রিক সাধনাও উহাতে সংযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই সময়ে বাংলায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম নয়, তান্ত্রিক-ধর্ম। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, তথাগত বুদ্ধ যে যুক্তিবাদী সত্যদর্শন প্রচার করেছিলেন তাঁর সেই দর্শনই অবলুপ্ত হয় তান্ত্রিক-ধর্মের প্রভাবে এবং তান্ত্রিক অনাচার বৌদ্ধধর্মের নৈতিক জীবনদর্শনকে ধ্বংস করে। ফলে বহিরাগত তুর্কিদের আক্রমণ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেমন ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয় তেমনি এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তাঁদের অনুসারী গৃহীদের একটি অংশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পালিয়ে ধর্ম ও জীবন রক্ষার চেষ্টা চালায়। বৌদ্ধদের ধর্মীয় নেতা ভিক্ষুদের অভাবে কালক্রমে বৌদ্ধ-অধ্যুষিত স্থানসমূহ বৌদ্ধশূন্য হয়। পণ্ডিতদের মতে এভাবেই চট্টগ্রামে বৌদ্ধগণ উপনিবিষ্ট হয়েছিল এবং কয়েকশত বছর ধরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এই চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিল। ইতিহাসকারগণের মতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ আরাকান রাজাদের রাজত্ব এবং পার্শ্ববর্তী ব্রহ্মদেশ বৌদ্ধ-অধ্যুষিত দেশ বলেই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর পক্ষে চট্টগ্রামে অবস্থান অনুকূল বিবেচিত হয়েছিল।

কিন্তু এই অনুকূল স্থানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি অনুকূল ছিল না। কালের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা আচার ও ধর্মাচরণে অনেক অবৌদ্ধ সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ ইত্যাদি যেমন বৌদ্ধদেরও সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল তেমনি ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে দেব-দেবীর পূজা এমনকি পশুবলিও, বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। বস্তুত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এসব অনাচার অনুপ্রবেশের প্রধান কারণ ছিল সঠিক নেতৃত্বের অভাব। বৌদ্ধদের ধর্মীয়-নেতা গৃহীরা নন— ভিক্ষুসংঘ। ধর্মপ্রচারের সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্বে ও কর্মপ্রেরণায় যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তেমনি গৃহীরাও তাদের জীবনাচরণের দিকনির্দেশনা লাভ করেছে ভিক্ষুদের কাছ থেকেই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় বৌদ্ধদের নবজাগরণের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন ধর্মপ্রাণ ও কর্মী পণ্ডিতভিক্ষুগণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারের পূর্বে রাউলীদের নেতৃত্বেই বৌদ্ধ সমাজ

টিকে ছিল। এই রাউলীরা ছিলেন পুরোহিত শ্রেণির ভিক্ষু। মূলত হিন্দু সমাজের প্রভাবেই কোনো এক অশুভ মুহূর্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাহপ্রথা চালু হয়। তাঁরাই ছিলেন রাউলী পুরোহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘরাজ সারমেধ চট্টগ্রাম তথা ভারতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করে থেরবাদ শিক্ষা সংযোগে বৌদ্ধধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময় থেকেই বাংলার সংঘরাজ নিকায়ভুক্ত বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরুর উপাধি হিসেবে সংঘরাজ শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সংঘরাজ সারমেধ ছিলেন প্রথম সংঘরাজ। সম্প্রতি লোকান্তরিত (২০০০ খ্রিঃ) সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো ছিলেন অষ্টম সংঘরাজ।

সংঘরাজ সারমেধ ও পরবর্তী সংঘরাজগণ

সংঘরাজ সারমেধ

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের সম্রাট বোধ প্লা আরাকান আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধকালে আরাকানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় বহু আরাকানী বাস্তুত্যাগ করে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় আরাকান রাজপরিবারের সম্পর্কিত কিছু লোক শ্রদ্ধেয় সারালঙ্কার মহাথেরের সঙ্গে এসে কক্সবাজারের অন্তর্গত হারবাং অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সেখানে ১৮০১ সালে সংঘরাজ সারমেধের জন্ম হয়। খুবই অল্প বয়সে তিনি আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় শ্রামণ সারমেধ। সুযোগ্য গুরুর যথাযথ তত্ত্বাবধানে সারমেধ উত্তমরূপে ধর্ম-বিনয় ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করেন। ১৮২১ সালে সারালঙ্কার মহাথেরের নিকট তাঁর শুভ উপসম্পদাকার্য সম্পাদিত হয়।

১৮২৬ সালে ব্রহ্মরাজ বগিড এবং ব্রিটিশ পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার ফলে আরাকান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের অধীনে আসে। এই সময় বহু আরাকানী শরণার্থী চট্টগ্রাম থেকে পুনরায় আরাকানে ফিরে যায়। আচার্য সারালঙ্কার মহাথের বৃদ্ধবয়সে তাঁর শিষ্য সারমেধ ভিক্ষুসহ আরাকানের রাজধানী আকিয়াবে ফিরে যান। আকিয়াবের কয়েকজন দাতা ছেরাগ্যা নদীর দক্ষিণ তীরে গদুভাঙ্গা খাড়ির উপকূলে এক বিহার নির্মাণ করে তাঁদেরকে দান

করেন। বিহারটির নাম রাখা হয় সারালঙ্কার বিহার। ১৮৩৬ সালে আচার্য সারালঙ্কারের মৃত্যুর পর সারমেধ থের এই বিহারের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির লিখেছেন :

> শ্রদ্ধেয় সারমেধ থের নূতন উদ্যমে সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি চট্টগ্রাম ও আরাকানের সর্বত্র পর্যটন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। তখন সবেমাত্র বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত, আকিয়াব সমগ্র আরাকানের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। আমদানী রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র আকিয়াবের প্রতিপত্তিশালী নাগরিকবৃন্দ, সরকারী কর্মচারী ও বণিককুলের সহায়তায় স্থানীয় ভিক্ষু-সংঘের চতুর্প্রত্যয়ও অনায়াসলব্ধ হইল। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ও বিনয়ানুকূল আচরণের দরুণ আচার্য সারমেধের যশঃ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তের—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল।

১৮৫৬ সালে সারমেধ মহাস্থবির সশিষ্য 'বুদ্ধগয়া' দর্শনে গেলে সেখানে তাঁর সাথে বৈদ্যপাড়া গ্রামের পুণ্যপুরুষ ভদন্ত রাধাচরণ মহাস্থবিরের (মাথে) সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। শ্রদ্ধেয় রাধাচরণ মহাস্থবির বাংলা ও বর্মি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। উপরন্তু সংস্কৃত, পালি ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। আচার্য সারমেধ বুদ্ধগয়ায় তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের অবস্থা, ভিক্ষুসংঘের আচার-ব্যবহার (বিনয়), সামাজিক বিধি-বিধান ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাধাচরণ মহাস্থবির বুদ্ধগয়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় চট্টগ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে ধর্ম-বিনয় ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদানের জন্য সারমেধ থেরকে চট্টগ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারমেধ মহাস্থবির সশিষ্য চট্টগ্রামে আগমন করে রাধাচরণ মহাস্থবিরের সঙ্গে একসাথে ঐতিহাসিক বৌদ্ধ পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড দর্শন করেন। অতঃপর রাধাচরণ মহাস্থবির তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি বৈদ্যপাড়ায় স্বীয় বিহারে আসেন। সারমেধ ভিক্ষুর আগমনে এ অঞ্চলে বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। এখান থেকে তিনি পাহাড়তলী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজপতি জমিদার শ্রীকালিচরণ মুৎসুদ্দী প্রমুখ বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণে মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে যান। মহামুনি বাংলার চাকমা, বড়ুয়া, মান, বোমাং প্রভৃতি সকল শ্রেণির বৌদ্ধদের মিলনক্ষেত্র। প্রতিবছর মহামুনির মেলায় উপর্যুক্ত সকল শ্রেণির বৌদ্ধ নরনারী সমবেত হতেন। সারমেধ থের তাঁদের সংঘের

সঙ্গে ধর্ম, বিনয়, ধর্মসংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সকলের প্রশংসা লাভ করে। সারমেধ থেরের জন্য ঐতিহাসিক মহামুনি বিগ্রহের পাশে শাক্যমুনি বিহার নির্মিত হয়। এ বিহারে তিনি দুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বড়ুয়া ও চাকমা সমাজের সর্বত্র বিচরণ করে তান্ত্রিক মতের অসারতা, বৌদ্ধ সমাজে অনুসৃত কুসংস্কার বিশেষত দেব-দেবীর পূজা ও পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান। এর ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা বন্ধ হয়।

১৮৫৭ সালে তৎকালীন চাকমারানী পুণ্যশীলা কালিন্দীরানী সারমেধ মহাথেরকে তাঁর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। সংঘরাজের ব্যবহারে ও ধর্ম-বিনয় দেশনায় শ্রদ্ধাভিভূতা হয়ে তিনি সে বছর রাজকীয় পুণ্যাহ উপলক্ষে সারমেধ মহাথেরকে আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত সীলমোহর প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করেন। এই সীলমোহরের অর্থ ছিল : "1219 A. E. The seal of Arakanese Sangharaja and Vinayadhara'। এরপর থেকে সারমেধ মহাথের সংঘরাজ নামেই প্রসিদ্ধ হন। অতঃপর তিনি আকিয়াব ফিরে যান।

সারমেধ মহাথেরের চট্টগ্রাম আগমন ও দুই বৎসর ধরে অবস্থানের ফলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। চট্টগ্রামের তদানীন্তন ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন ১৮৫৫ সালে কলকাতা মহানগরে অবস্থান করতেন। সে সময় জরিপ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা মিঃ পল (Mr. Paul) সিংহল হতে বদলি হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তাঁর কাছে 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' অধ্যয়নকালে বুঝতে পারেন যে, চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা যথার্থ বিনয়ধর্ম মেনে চলেন না। বিশেষত তাঁরা অনেকেই ২০ বৎসর বয়সের কম বয়সে উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন বলে উপসম্পদাও শুদ্ধ নয়। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম ফিরে এসে ১৮৬০ সালে আকিয়াব গমন করেন। সেখানে সংঘরাজের বিহারে কয়েকমাস বিনয়-ধর্ম চর্চা করার পর পূর্ব-উপসম্পদা ত্যাগ করেন। অতঃপর সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে স্থানীয় ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক 'উদক-উক্ষেপ সীমায়' পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এর দু'মাস পর তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে

ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তিনি পুনরায় উসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় সংঘরাজপদে বৃত হয়েছিলেন।

এ সমস্ত কারণে চট্টগ্রামের ভিক্ষুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং তাঁরা থেরবাদ মতে প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণে আগ্রহী হন। তজ্জন্য তাঁরা সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরকে চট্টগ্রাম আগমনের আহ্বান জানান। তিনি ১৮৬৪ সালে বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে জলপথে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁরা পাহাড়তলী এসে তাঁদের জন্য পূর্বনির্মিত বিহারে উঠলেন। এখানে বিনয় সম্বন্ধে আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে থেরবাদের অনুগামী প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করবেন। মহামুনি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বের মনোরম পাহাড়-ঘেরা হাঞ্চার ঘোনার এক পার্বত্য ছড়াবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জলস্রোতের উদকসীমা (নদী সীমা) শুভ উপসম্পদা দানের যোগ্য স্থান হিসেবে বিবেচিত হল। হাঞ্চার ঘোনার উদক সীমায় সংঘরাজ সারমেধের উপাধ্যায়ত্বে চট্টগ্রামের ৭ জন রাউলী ভিক্ষু সর্বপ্রথম বিনয়সম্মত থেরবাদী আদর্শে নতুন করে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন (১) পাহাড়তলীর জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির, (২) ধর্মপুরের হরি মহাস্থবির, (৩) মির্জাপুরের সুধন মহাস্থবির, (৪) গুমানমর্দনের দুরাজ মহাস্থবির, (৫) বিনাজুরির হরি মহাস্থবির, (৬) পাহাড়তলীর কমল ঠাকুর, এবং (৭) দমদমার অভয়াচরণ মহাস্থবির। এই ঘটনার পর প্রতিদিন দলে দলে বহু রাউলী পুরোহিত নতুন করে উপসম্পদা গ্রহণ করতে থাকেন। এবার সংঘরাজ মহাথের এক বৎসর চট্টগ্রামে অবস্থান করে ভিক্ষুসংঘকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দেন। এই নব-উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হল 'সংঘরাজ নিকায়' এবং আচার্য সারমেধ মহাস্থবির হলেন সেই নিকায়ের প্রথম সংঘরাজ।

ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন্ মিন্ বৌদ্ধধর্মের স্থিতি ও প্রচার-প্রসারের জন্য মান্দালয়ে সমগ্র ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করান। এ উৎকীর্ণনের কাজ ১৮৬০ সালে শুরু হয়ে ১১ বৎসর ধরে চলে। শেষের দিকে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক সদ্ধর্ম সংগায়নের ব্যবস্থা হয়। এ সংগায়নই পঞ্চম বা শিলালিপি সংগীতি। ব্রহ্মরাজের আমন্ত্রণে সংঘরাজ সারমেধ মহাথের ও তাঁর শিষ্য উঃ অগ্‌গ মহাথের এতে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করার পূর্বে প্রতিশোধকার্য সমাধা করার ভার তাঁকে অর্পণ

করা হয়। তিনি মাত্র এক বর্ষাবাসে এই মহান কার্য সমাধা করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন তাঁকে "সারমেধাভিতিসাসনধজ মহাধম্ম-রাজাধি-রাজগুরু" উপাধি ও সীলমোহর দিয়ে সম্মানিত করেন। সংঘরাজ সারমেধ অতঃপর আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের বাকি দিনগুলি ধর্ম-বিনয় প্রচারে ব্যাপৃত থেকে এখানেই অতিবাহিত করেন তিনি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে ৬১ তম উপসম্পদাবর্ষে এই ধর্মবীর মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন।

আচার্য পুণ্নাচার

প্রথম সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের মৃত্যুর পর আচার্য পুণ্নাচার দ্বিতীয় সংঘরাজ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীনাম চন্দ্রমোহন। ১১৯৭ মগাব্দের (১৮৩৭ খ্রিঃ) ৫ আষাঢ় চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত উনাইনপুরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ১২১৩ মগাব্দের শুভ মাঘী পূর্ণিমা মেলার সময় চন্দ্রমোহন ঠেগরপুনি গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বুড়া গোঁসাইর চৈত্যাঙ্গনে শ্রীমোহনলাল মহাথেরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১২১৫ মগাব্দে তিনি বেলখাইন নিবাসী মহাথের মধুচরণ ঠাকুরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। দুই বৎসর সেখানে শিক্ষাগ্রহণের পর কলকাতা যান। সেকালে কলকাতা যাওয়ার জন্য স্টিমার কিংবা রেলগাড়ির সুবিধা ছিল না। তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন নৌকাযোগে। পথে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে একমাস পর তিনি কলকাতা পৌঁছেন এবং ওয়ারিস বাগান বিহারে বসবাস করতে শুরু করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জরিপ বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মিঃ পল নামে একজন ইংরেজের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর নিকট তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা আরম্ভ করেন।

অতঃপর কলকাতা থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি শাস্ত্রানুসারে উপসম্পদা গ্রহণের জন্য আকিয়াব যান। সেখানে সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে দুই মাস পর নৌকাযোগে আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু রোগযন্ত্রণা অত্যধিক হওয়ায় কবিরাজদের পরামর্শে তিনি চীবর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসর। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর পিতার নিকট কবিরাজি শিখতে শুরু করেন।

১২২৩ মগাব্দে চন্দ্রমোহন জীবিকার সন্ধানে পুনরায় কলকাতা গিয়ে

কবিরাজি আরম্ভ করেন। এ সময় শ্রীলঙ্কানিবাসী দুইজন ভিক্ষু, তিনজন শ্রামণ ও তিনজন সেবকসহ ব্রহ্মদেশের মান্দালয় যাওয়ার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। চন্দ্রমোহন তাঁদের সাথে মান্দালয় যান এবং সেখানে রাজগুরু সংঘরাজের বিহারে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। সংঘসভার সদস্যগণ তাঁকে 'পুণ্ণাচার ধম্মধারী' উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তিনি 'পুণ্ণাচার' নামেই পরিচিত ছিলেন। বার্মায় বৎসরাধিক কাল অবস্থানের পর তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য শ্রীলঙ্কা যাত্রা করেন। পাঁচ বৎসর পর তিনি শ্রীলঙ্কা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। এর দুই বৎসর পর সংঘরাজ সারমেধ কর্তৃক চট্টগ্রামের ভিক্ষুগণকে থেরবাদে দীক্ষা দেওয়ার পর নবগঠিত সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুগণ তাঁকে আচার্য পদে বরণ করেন এবং ধর্ম ও বিনয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সুগভীর নিষ্ঠার কারণে তিনি আচারিয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বাংলা, পালি, হিন্দি, বর্মি ও সিংহলি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এই পাঁচটি ভাষায় ধর্মদেশনা করতে পারতেন। তিনিই বঙ্গদেশে শুদ্ধরূপে পালি উচ্চারণ করতে শেখান।

১৮৮২ সালে সংঘরাজ সারমেধের তিরোধানকালে তিনি ব্রহ্মদেশে অবস্থান করছিলেন। তদপূর্বে ১২২৮ মগাব্দে তিনি বুদ্ধগয়া আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নির্দেশিত স্থানে উৎখনন কার্যের ফলে সমগ্র বুদ্ধগয়া মন্দির উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। সংঘরাজের দেহত্যাগের পর শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার মহাথের সংঘরাজ নিকায়ের নায়ক পদে অভিষিক্ত হন। তিনিই সংঘরাজ দলের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আচার্য পুণ্ণাচারকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানান। দেশে ফিরে আসার পর সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ তাঁকে মহানায়ক পদে অভিষিক্ত করেন।

১৮৮৪ সালে পাহাড়তলী মহামুনি মন্দির প্রাঙ্গণে এক পালি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য পুণ্ণাচার মহাস্থবির। এর পর থেকে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে পালি ভাষার মাধ্যমে ত্রিপিটক শাস্ত্র চর্চার সূত্রপাত হয় এবং তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে বহু শিক্ষার্থী উচ্চ গবেষণার জন্য বিদেশ গমন করেন। আচার্য পুণ্ণাচার মহাস্থবিরের প্রেরণায় বিনয়কর্মের সুবিধার্থে শাক্যমুনি মন্দিরপার্শ্বে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৭০ মগাব্দের ২২ মাঘ ৭৩ বৎসর ৭ মাস বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৩৮-১৯২৭ খ্রিঃ) তৃতীয় সংঘরাজ পদে অভিষিক্ত হন পুণ্ণাচার মহাস্থবিরের তিরোধানের পর। জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবিরের

জন্ম ১২০০ মগাব্দের (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) ১৩ চৈত্র রাউজান থানার অন্তর্গত পাহাড়তলী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতার নাম জীবনবালা দেবী। তাঁর গৃহীনাম ছিল লালমোহন। শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১২১০ মগাব্দে মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁর মাতৃদেবী তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করান। লালমোহন অল্প সময়ের মধ্যে বর্মি ভাষা ও পালি সূত্রাদি আয়ত্ত করেন। লালমোহন ১৪ বছর বয়সে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন চন্দ্র মহাস্থবির (চান মাথে)। ১৮৬৪ সালে হাঞ্চার ঘোনায় আয়োজিত সারমেধ মহাস্থবিরের উপসম্পদাদান অনুষ্ঠানে তিনিও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উপসম্পদান্তে তাঁর নাম রাখা হলো জ্ঞানালঙ্কার স্থবির।

জ্ঞানালঙ্কার ছিলেন সদ্ধর্মপ্রাণ আদর্শ সংগঠক। তিনি ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে 'সংঘসম্মিলনী' নামে একটি সভা গঠন করেন। বর্ষাবাস সমাপ্ত হওয়ার পর সম্মিলনীর ভিক্ষুগণ পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারে সমবেত হতেন। এখানে সমাজের বিভিন্ন স্থানের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হতো। অতঃপর ভিক্ষুগণ দলবদ্ধভাবে গ্রাম থেকে গ্রামন্তরে গমন করে ধর্মশিক্ষা প্রদান করতেন এবং ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে আলোচনা করতেন। ১৯০৯ সালে সংঘরাজ পুণ্নাচার মহথেরো পরলোক গমন করার পর শ্রীমৎ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির তৃতীয় সংঘরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অতিশয় দয়ালু, উদার ও পরহিতব্রতী ছিলেন। ১২৮৯ মগাব্দের (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) ২২ জ্যৈষ্ঠ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

তাঁর দেহাবসানের পর চতুর্থ সংঘরাজ পদে বৃত হন শাসনধ্বজ বরজ্ঞান মহাস্থবির (১৮৬৭-১৯৩৬ খ্রিঃ)। ১৯৩৬ সালে শাসনধ্বজ বরজ্ঞান মহাস্থবিরের তিরোধানের পর পঞ্চম সংঘরাজ পদে অভিষিক্ত হন তেজবন্ত মহাস্থবির (১৮৬৪-১৯৪২ খ্রিঃ)। তেজবন্ত মহাস্থবিরের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ সংঘরাজ নির্বাচিতন হন ধর্মকথিক ধর্মানন্দ মহাস্থবির (১৮৭৩-১৯৫৭ খ্রিঃ)। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর সপ্তম সংঘরাজ পদে বৃত হন সদ্ধর্মকীর্তি অভয়তিষ্য মহাস্থবির (১৮৮৬-১৯৭৪)। অতঃপর অষ্টম সংঘরাজ পদে অভিষিক্ত হন শীলালঙ্কার মহাথেরো (১৯০০-২০০০ খ্রিঃ)।

যে-সব জ্ঞানী ও পণ্ডিত ভিক্ষু সংঘরাজ পদে বৃত হয়েছিলেন তাঁরা ছাড়াও আরও বহু কর্মযোগী সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধভিক্ষু বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্ম-বিনয় শিক্ষাদান ও সমাজে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে মহামূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের ধর্ম ও কর্মসাধনার মাধ্যমেই বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে

সদ্ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং ধর্ম-বিনয় অনুসরণের বৌদ্ধোচিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব কর্মযোগী বৌদ্ধভিক্ষু এবং ধর্মপ্রাণ বিশিষ্ট দায়কদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুলিখিত পরিচিতি সহ বাঙালি বৌদ্ধ চরিতাভিধান রচিত ও প্রকাশিত হলেই কেবল বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্মানুশীলন ও সমাজ প্রগতির প্রকৃত পরিচয় লাভ সম্ভব। এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য।

শীলালঙ্কার জীবনালেখ্য

জন্ম ও শৈশব-কৈশোর এবং শিক্ষাজীবন

অষ্টম সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরোর জন্ম ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন শুক্রবার চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন নানুপুর গ্রামে। নাজিরহাট রেলস্টেশন হতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নানুপুর বৌদ্ধ-অধ্যুষিত গ্রাম। যে পরিবারে শীলালঙ্কারের জন্ম হয়েছিল সে পরিবারটি ছিল একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। তাঁর গৃহীনাম সহদেব, পিতা জয়ধন বড়ুয়া (সওদাগর), মাতা শ্যামাবতী বড়ুয়া। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল মুনসীরাম। পিতামহ লালমন বড়ুয়া ছিলেন বিত্তশালী লোক। তাঁর চারপুত্র—জীবধন, জয়ধন, রামসুন্দর ও পণ্ডিত বড়ুয়া। জীবধনের পাঁচ পুত্র, যথা—হরকিশোর, রাজকিশোর, নবকিশোর, নগেন্দ্র ও গুড়াধন বড়ুয়া। জয়ধন বড়ুয়ার দুই পুত্র– মুনসীরাম ও সহদেব; এবং রামসুন্দরের একটিমাত্র পুত্র– সুধাংশু বিমল বড়ুয়া। সর্বকনিষ্ঠ পণ্ডিত বড়ুয়া অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

শীলালঙ্কার মহাথেরো তাঁর পরিবার ও বাল্যকাল সম্পর্কে লিখেছেন :

তখন আমার একটু একটু বুদ্ধি হয়েছে। আমাদের ধান্যের গোলা ধান্যে পূর্ণ, গরুপূর্ণ গোশালা–ক্ষেত-কৃষ্টি, অর্থ-বিত্ত যেদিকে চাই, সেদিকই পরিপূর্ণ। অভাব-অনটন কিরূপ তা জানি না, কোনদিন অনুভবও করিনি। এককথায় বলতে গেলে অবস্থা বেশ সচ্ছল।

খুল্লতাত রামসুন্দর বড়ুয়ার ব্যবসাবুদ্ধি অতি চমৎকার। তিনি বড় ভাগ্যবান, পুণ্যপ্রভাবও ছিল তাঁর সমুজ্জ্বল। খুব তেজস্বী ও পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি। দেশবাসী তাঁকে সমীহ করে চলতো এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। তিনি প্রত্যেকের প্রতিই মৈত্রী করুণা চিত্তে সদয় ব্যবহার করতেন। জীবনে কারো সাথে তিনি বাদ-বিসম্বাদ বা মামলা-মোকদ্দমা করেন নি, এটা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। এটাই তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম জীবনে তাঁর কোনও পুত্র-কন্যা ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি তিনি পুত্রাদপি স্নেহ পোষণ করতেন, কিন্তু তা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। তাঁর বহিঃপ্রকাশ বড় কঠোর মনে হত, তাও পরিজনদের প্রতি। তাঁর নিকট এমন এক তেজোময়ী প্রতিভা ও প্রভুশক্তি বিদ্যমান ছিল যে, আমরা পরিবারস্থ সকলেই তাঁকে অত্যধিক ভয় করতাম। অপিচ তাঁর অন্তর ছিল দয়ার্দ্র ও স্নেমমমতায় ভরপুর। আমাদের স্বগ্রামের বিহারের পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য ও উন্নতির সব কিছুই তাঁর দান। এটা তাঁর কর্মময় জীবনের অমর অবদান। প্রত্যহ প্রাতঃ-সন্ধ্যা দুবেলা তিনি বিহারে গিয়ে বন্দনা ও ফুল-প্রদীপ পূজা করতেন। বলা বাহুল্য, এটা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

সহদেব নিতান্ত শৈশবে মাতৃহারা হন। কিন্তু কাকীমার স্নেহে প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি কখনও মায়ের অভাব বোধ করেন নি। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত জীবধন বড়ুয়া খুব তেজস্বী ও আত্মমর্যাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সামান্য কারণে তিনি ভ্রাতাদের থেকে গৃহগন্ন হয়েছিলেন। কাকা রামসুন্দর বড়ুয়া চট্টগ্রাম শহরে আছদগঞ্জে ব্যবসা করতেন। সেখানে তাঁর দোকান ছিল। পিতা জয়ধন বড়ুয়া গ্রামের বাড়িতে থেকে বাড়ির যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করতেন। সেকালে একান্নবর্তী পরিবারগুলির মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল এবং এতে পারিবারিক সংহতি অক্ষুণ্ন থাকতো।

জ্যেষ্ঠতাত জীবধন বড়ুয়ার অকালমৃত্যু হয়। তারপর তাঁর স্ত্রীও মারা যান। ভ্রাতুষ্পুত্রদের অসহায় অবস্থা দেখে জয়ধন ও রামসুন্দর তাদের আবার একান্নবর্তী করেন। কাকা রামসুন্দর বড়ুয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র হরকিশোর বড়ুয়াকে চট্টগ্রাম শহরের আছদগঞ্জে নিজস্ব দোকানে নিয়ে যান এবং দোকানের কাজে নিয়োগ করেন। এই হরকিশোর বড়ুয়াই পরে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রূপে হরকিশোর মহাজন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

সহদেব গ্রামের নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। সেখানকার পাঠ শেষ করে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সে বিদ্যালয়ে পড়া শেষ হওয়ার পর চট্টগ্রাম শহরে জে. এম. সেন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই তাঁর জীবনে পরিবর্তনের পর্ব সূচিত হয়। এ সময় তাঁর খুল্লতাত রামসুন্দর বড়ুয়া জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতালের ইংরেজ বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় ক্রমশ তিনি আরোগ্যলাভের

পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ সময় সেই ইংরেজ চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি শহরের দোকান থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। সম্ভবত নিজের অসুস্থাবস্থার কারণেই রামসুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্র সহদেবকে এ সময় লেখাপড়া বন্ধ করে দোকানের কাজকর্ম করার জন্য আদেশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সহদেব যেন দোকানের কাজকর্ম শিখে হরকিশোরের সঙ্গে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। সেকালে এরূপ চিন্তাই স্বাভাবিক ছিল। উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তেও চাকরি-বাকরির সুযোগে সীমিত থাকতো বলেই ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেদের সাধারণত দোকানদারি চালানোর মতো শিক্ষা গ্রহণের পরই ব্যবসার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য বলা হতো। সহদেবের ক্ষেত্রেও এরূপই ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর ভবিতব্য ছিল অন্যরূপ।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ

সহদেব ছোটবেলা থেকেই গ্রামের বিহারে যাতায়াত করতেন এবং সকাল-সন্ধ্যা বিহারের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করতেন। বস্তুত তাঁদের বাড়ির সকলেই সর্বক্ষণ বিহার ও ভিক্ষুর তত্ত্বাবধান করতেন। শীলালঙ্কার মহাথেরো লিখেছেন (পাণ্ডুলিপি : আমার জীবন কথা। সূত্র : বিমলেন্দু বড়ুয়া রচিত *সংঘরাজ শীলালঙ্কারের মহৎ জীবনালেখ্য*) :

> ... প্রাতঃসন্ধ্যা বিহারের ব্রত ও বন্দনা-পূজা আমার জীবনের প্রধান ব্রত এবং পঞ্চশীল প্রতিপালনে ছিল সবিশেষ যত্ন। মাংস খাওয়া আমি ত্যাগ করেছিলাম। সকলেই আমায় 'সাধু' বলে ডাকতো। শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে আমার ১৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এতে ইন্ধন যোগাল শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী সঙ্কলিত 'রত্নমালা' নামক গ্রন্থ। ইতিপূর্বে সেই মহান গ্রন্থ থেকে বন্দনাগাথা ও মৈত্রী ভাবনাদি এবং মঙ্গলসূত্র, রত্নসূত্র, করণীয় মৈত্রীসূত্র ও জয়মঙ্গল অষ্টগাথা প্রভৃতি কয়েকটা সূত্র কণ্ঠস্থ করেছিলাম।
>
> তখন আছদগঞ্জে আমাদের দোকানে আমি অবস্থান করছি বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে মন কিছুতেই আকৃষ্ট হচ্ছে না।... এমন সময় একদিন আমি দিবা আহারের পর দোকানের দ্বারদেশে বসে 'রত্নমালা' বইটি অভিনিবেশে সহকারে পাঠ করছি। এমতাবস্থায় আমার এমন এক অভূতপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হল যে, মনে হল, বিষয়মুক্ত হয়ে গেছে যেন আমার চিত্ত, অন্তরে হল বিরাগের সঞ্চার,

বিবেক যেন আমায় কোথাও উধাও করতে চায়। সেক্ষণেই সংসার ছেড়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের এমন এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, যা দুর্বার অপ্রতিরোধ্য।...

এ ঘটনার পর সহদেব প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুমতি নিতে বাড়ি গেলেন। কিন্তু সবার অনুমতি পাওয়া গেলেও পিতৃব্য রামসুন্দরের অনুমতি পাওয়া গেল না। তিনিই ছিলেন তাঁদের পরিবারের প্রকৃত কর্তা। অতএব সহদেব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু মনে তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল। অতঃপর বড় দাদা হরকিশোর বাড়ি এলে তিনি আবার আছদগঞ্জের দোকানে ফিরে গেলেন। এই সময়ে আকিয়াব জাতীয় বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ খ্যাতনামা সুপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কোনো এক কাজে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। আকিয়াব ফেরার পথে তিনি আছদগঞ্জে সহদেবদের দোকানে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এবার সহদেব সুযোগ পেয়ে তাঁর কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও বাড়িতে পিতৃব্যের অনুমতি প্রদানে অনীহার কথা জানালেন। সব শুনে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির বললেন, 'তজ্জন্য চিন্তার কি আছে? আকিয়াবে আমার নিকট চলে এস।" তাঁর মনে হলো– তিনি যেন পথের দিশা খুঁজে পেয়েছেন। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় এক রাত্রি থাকার পর পরদিন আকিয়াব রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এর কিছুদিন পর সহদেব একটি কাজে সদরঘাট গিয়ে সেখানে আকিয়াবের জাহাজে আরোহণ করলেন। টিকেটের মূল্য পাঁচ টাকা। পরদিন প্রভাতে স্টিমার আকিয়াব পৌঁছলে সহদেব একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে জাতীয় বিহারে উপনীত হলেন। বিহারাধ্যক্ষ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির তাঁকে দেখেই তাঁর আগমনের হেতু বুঝতে পারলেন। সহদেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন তিনি; তারপর দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতে বললেন। বিকেলে বিশ্রামের পর মহাস্থবির মহোদয় কয়েকটি বই দিলেন সহদেবকে। এ বইগুলি ছিল প্রব্রজিতের প্রথম শিক্ষার উপযোগী। কোন বিষয় শিখতে হবে মহাস্থবির মহোদয় তাও তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। সহদেব মনোযোগ সহকারে বইগুলি পাঠ করতে শুরু করলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় প্রব্রজিত হওয়ার সুযোগ সহদেব পেলেন না। পরদিন সকালে তাঁর অগ্রজ সহোদর ভ্রাতা মুনসীরাম তাঁর খোঁজে আকিয়াব জাতীয় বিহারে উপস্থিত হলেন। তিনি বড় ভন্তে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরকে জানালেন যে,

চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন

শীলালঙ্কারের উপসম্পদা গ্রহণের আগে থেকেই প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির আকিয়াব বিহার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপসম্পদা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়ার দু'সপ্তাহ পর প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির রেঙ্গুন চলে গেলেন। শীলালঙ্কার ও ধর্মতিলক চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত তেকোটা গ্রামে এসে পৌছলেন। সেখানকার সদ্ধর্মবিকাশ বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ছিলেন তাঁদের গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তাঁরা এ বিহারেই অবস্থান করতে লাগলেন। ব্রহ্মদেশ পর্যটন শেষে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির তিন মাস পরে তেকোটা বিহারে উপস্থিত হলেন। সেখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে মায়ানী গ্রামে গিয়ে পৌছলেন। মায়ানী গ্রামে অবস্থানকালে ভিক্ষু শীলালঙ্কার সংবাদ পান যে, তাঁর পিতৃব্য রামসুন্দরের রোগ জটিল আকার ধারণ করেছে। তিনি তাঁকে দেখার জন্য স্বগ্রাম নানুপুর চলে এলেন। সন্ধ্যায় পিতৃব্য সকাশে পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করলেন তিনি। পরদিন সকাল আটটার সময় রামসুন্দর দেহত্যাগ করলেন। পিতৃব্য রামসুন্দরের সাপ্তাহিক ক্রিয়াশেষে ভিক্ষু শীলালঙ্কার আবার মায়ানী গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে নবনির্মিত বৌদ্ধবিহারে বর্ষাবাস করার পর তিনি এবং ধর্মতিলক আবার তেকোটা গ্রামে চলে যান। এখানে তিন মাস ধরে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করলেন। অতঃপর গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির তাঁর ও ভিক্ষু ধর্মতিলকের শ্রীলঙ্কা গমনের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের শ্রীলঙ্কা গমনের তারিখ নির্দিষ্ট হল। শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের শিষ্য জ্যোতিঃপাল ভিক্ষুও তাঁদের সঙ্গী হলেন। তাঁরা শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি তারিখে (১২৮৪ মগী, ১০ মাঘ)।

প্রথমে ট্রেনযোগে তাঁরা কলকাতা গিয়ে সেখানে ধর্মাঙ্কুর বিহারে ১২ দিন অবস্থান করেন। এই ধর্মাঙ্কুর বিহারেই তাঁদের সিংহল যাত্রার সঙ্গী হলেন আর্যবংশ স্থবির ও তাঁর একজন শ্রামণ। কলকাতা থেকে আবার ট্রেনে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে মাদুরা এবং মাদুরা থেকে ধনুস্কুটি গিয়ে সেখান থেকে স্টিমারে করে তালিমান্নার ঘাট—তারপর আবার ট্রেনে চড়ে কলম্বো। কলম্বোয় একটি বিহারে একরাত অবস্থান করে পরদিন পানাদুরে সদ্ধর্মোদয় পরিবেণে উপস্থিত হলেন তাঁরা। সেখানে দু'জন বাঙালি ভিক্ষু আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। তাঁরা হলেন– ভিক্ষু গুণালঙ্কার এবং ভিক্ষু অগ্রলঙ্কার।

সদ্ধর্মোদয় বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ তথা মহাচার্য ছিলেন তখন উপসেন মহাস্থবির। তিনি ছিলেন তখনকার একজন প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ভিক্ষু। তাঁর সহযোগী অর্থাৎ দ্বিতীয় আচার্য বুদ্ধদত্ত (বুদ্ধরক্ষিত?) মহাস্থবিরও ছিলেন একজন অতি গুণবান ও শীলবান ভিক্ষু। ভিক্ষু শীলালঙ্কার পানাদুর বিহারে দু'বৎসর অবস্থান করে গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র ও ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মহাতীর্থ ক্যান্ডি যাত্রা করেন। এখানেই ছিল ভগবান বুদ্ধের দন্তধাতু। সেখানে উভবর্ত নামক স্থানে সদ্ধর্মোভাস পরিবেণে পণ্ডিত ধর্মদর্শী মহাস্থবিরের আশ্রয়ে অবস্থান করে অধ্যয়নে রত থাকেন। এ দু'বৎসরের মধ্যে তিনি সৌভাগ্যক্রমে তিনবার দন্তধাতু দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্যান্ডিতে অবস্থানকালে ভিক্ষু শীলালঙ্কার অনুরাধাপুরের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। সেখানকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবর্ণমালী মহাচৈত্যের অনতিদূরেই ছিল পুণ্যপ্রসূ মহাবোধিতরু। সম্রাট অশোকের কন্যা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা ২৩০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে গিয়েছিলেন সিংহলে। অনুরাধাপুরে সেটি রোপণ করেছিলেন তিনি।

ভিক্ষু শীলালঙ্কার চার বৎসর সিংহলের পানাদুর ও ক্যান্ডিতে অবস্থান করে ধর্ম, বিনয় ও অভিধম্ম শিক্ষা করেছিলেন থেরবাদী বৌদ্ধবিহারগুলিতে। পানাদুর সদ্ধর্মোদয় পরিবেণ-এর প্রধান ভিক্ষু উপসেন মহাস্থবির ছিলেন শুদ্ধবাদী 'রামাইয়া নিকায়'-এর অন্যতম প্রধান ধর্মবেত্তা। এজন্য বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম-বিনয় বিষয়ে তিনি কঠোর নীতিবাদী ছিলেন এবং ধর্মানুশীলনে শৃঙ্খলাপরায়ণতা খুবই প্রয়োজন মনে করতেন। ভিক্ষু জীবনের প্রারম্ভে উপসেন মহাস্থবিরের শৃঙ্খলাপরায়ণতার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল শীলালঙ্কারের পরবর্তী জীবনে। তাই সারা জীবন তিনি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগের সাথে ধর্মানুশীলন করে গেছেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করেছেন।

শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালেই ভিক্ষু শীলালঙ্কার সাহিত্যকর্মে আকৃষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> এক বৎসর পরের কথা। প্রবন্ধ ও গল্প লেখার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথম লিখলাম "রাজা ধর্মশৌণ্ডের কাহিনী।" এটাই আমার জীবনের প্রথম লেখা নিবন্ধ। তখন কলিকাতা হতে শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদনায় 'বৌদ্ধবন্ধু' নামক একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। ইহাই বড়ুয়া জাতির একমাত্র মুখপাত্র। আমার লেখাটি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। পত্রিকায় তা

ছাপা হলো। তিনি আমার নিকট এক কপি পত্রিকা পাঠিয়ে দিলেন। মুদ্রিতাকারে আমার লেখাটি দেখে খুবই আনন্দানুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে একখানা উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখলেন। এতেই সাহিত্য সাধনার প্রতি আমার মন বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ে। আমিও তজ্জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

সিংহলে থাকার সময় ভিক্ষু শীলালঙ্কার আরেকটি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। সেটি হলো সিংহলী ভাষায় রচিত সচিত্র জিনরাজ চরিত (বুদ্ধের জীবনী) অবলম্বনে বুদ্ধের জীবনী রচনা। এ কাজটি করার জন্য তিনি পালি ভাষায় রচিত বইগুলিরও সাহায্য নিয়েছিলেন। বুদ্ধাঙ্কুর সুমেধ তাপসের জীবনী দিয়ে বইটি শুরু করেছিলেন তিনি। তারপর অনুক্রমে অষ্টবিংশতি বুদ্ধের পরিচিতি লেখা আরম্ভ করে মঙ্গলবুদ্ধ পর্যন্ত লেখা সমাপ্ত হলে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি।

সিংহল হতে প্রত্যাবর্তন

১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে মহাচার্য উপসেন মহাস্থবির এবং অন্য আচার্য ও ভিক্ষুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিক্ষু শীলালঙ্কার স্টিমারে রেঙ্গুন আসেন। রেঙ্গুনে এসে কান্দগ্লে ধর্মদূত বিহারে গুরু ভন্তে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। দু'মাস রেঙ্গুনে অবস্থান করে চট্টগ্রাম ফিরে এলেন। এবার জন্মস্থান নানুপুর বিহারে এসে উঠলেন তিনি। তারপর সেখানে অতিবাহিত করলেন দু'বৎসর। অতঃপর আবার গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহ্বান পেয়ে কলকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারে উপনীত হলেন। সেখানেই তখন বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে অবস্থান করছিলেন প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। তিনি ছিলেন কর্মবীর ভিক্ষু। ধর্মাঙ্কুর বিহারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন' এবং 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মাঙ্কুর বিহারে এসেও তিনি বিহারের সংস্কারকার্য সমাধা করেন। অতঃপর ভিক্ষু শীলালঙ্কারকে সেখানে রেখে তিনি চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। ভিক্ষু শীলালঙ্কার ধর্মাঙ্কুর বিহারের নতুন বিহারাধ্যক্ষ হলেন। এ সময়ে রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস হতে 'সংঘশক্তি' পত্রিকা এবং শারীপুত্র, মহাকাশ্যপ প্রমুখ বুদ্ধের শ্রাবক সংঘের জীবনী প্রকাশিত হচ্ছিল। ভিক্ষু শীলালঙ্কার লিখলেন 'রাহুল চরিত'। সে বছরই সেটি প্রকাশিত হলো বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। 'রাহুল চরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যকর্মের প্রতি তাঁর উৎসাহ সমধিক বর্ধিত

হয়। অতঃপর তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে তিনি 'ধর্মপদার্থকথার যমকবর্গ' বঙ্গানুবাদে ব্রতী হলেন। ১৯৩০ সালের শেষভাগে 'যমকবর্গ' অনুবাদ করতে শুরু করেন তিনি। এক বৎসরের কিছু বেশি সময় লাগল তাঁর অনুবাদ শেষ করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে। অতঃপর ভিক্ষু শীলালঙ্কার 'অজাতশত্রু' বইটি লিখতে শুরু করেন ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে। সাত মাস সময় লাগল তাঁর পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করতে।

বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ শাসন সূচিত হওয়ার পর কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। এ সময়ে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কেন্দ্র এবং বাণিজ্যস্থল ও আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা ইত্যাদির কারণে কলকাতা মহানগরী হয়ে ওঠে নানা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। পরবর্তীকালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলেও বাংলার রাজধানী হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব অব্যাহত ছিল। কলকাতা মহানগরী সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের মানুষ এখানে আসতে শুরু করে। চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধরাও অনেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ধর্মকৃত্য সম্পাদনের জন্য সে সময় কলকাতায় কোনো বৌদ্ধবিহার ছিল না। তাই প্রবাসী বৌদ্ধদের উদ্যোগে বহুবাজার অঞ্চলে ৭২/৭৩ নং মলঙ্গা লেনে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টলগৌরব কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে উক্ত বিহারে অবস্থান ও সুপণ্ডিত মহাবীর মহাস্থবির মহোদয়ের নিকট ধর্ম-বিনয়াদি শিক্ষা করতে শুরু করেন। এখানে তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে উক্ত বিহারস্থান সরকারের হস্তগত হয়। অতঃপর কৃপাশরণ মহাস্থবির উক্ত স্থান ত্যাগ করে ১৬নং বউবাজার স্ট্রীটে রানী স্বর্ণময়ী প্রদত্ত এক কাঠা চার ছটাক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মহানগর বিহারে ১৩ বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি ১২৯৮ সালের (১২৯৮ খ্রিঃ) আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র পাঠ করে 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। কৃপাশরণ মহাস্থবির সভার স্থায়ী সভাপতি এবং সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে কৃপাশরণ মহাস্থবির কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে ৫ নং ললিত মোহন দাস লেনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে ৫ কাঠার মতো জমি নিজ নামে ক্রয় করেন। এই জমির উপরই 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার' নির্মাণ আরম্ভ

হয়। এই সময় জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ গুণালংকার মহাস্থবির তাঁর সহকর্মী রূপে যোগদান করেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিহার নির্মাণ সুসম্পন্ন হয়। ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৮ আষাঢ় আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ধর্মাঙ্কুর বিহারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব ও বর্ষাবাস ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মাঙ্কুর বিহারকে কেন্দ্র করেই কর্মযোগী ও শিক্ষানুরাগী কৃপাশরণ মহাস্থবির আমৃত্যু দেশ, দশ ও সমাজের উন্নতির জন্য বহুবিধ প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে কৃপাশরণ মহাস্থবির তাঁর প্রাণপ্রিয় ধর্মাঙ্কুর বিহারে সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পূতদেহ সসম্মানে চট্টগ্রামে তাঁর জন্মভূমি উনাইনপুরা গ্রামে প্রেরিত হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কৃপাশরণ মহাস্থবিরের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর শীলালঙ্কার মহাস্থবির ধর্মাঙ্কুর বিহারে আগমন করেন।

এই সময় চট্টগ্রামে কানাইমাদারী গ্রামে 'পরিবাস ব্রত' উদ্‌যাপনের এক বিরাট সমারোহ আরম্ভ হয়। শীলালঙ্কারের গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ধর্মতিলক ভিক্ষু ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। গুরুদেবের আহ্বানে ভিক্ষু শীলালঙ্কার 'পরিবাস ব্রত' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর আবার কলকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহারে ফিরে আসেন। কলকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থানকালে ভিক্ষু শীলালঙ্কার তিনবার বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ দর্শনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গ তিনি লিখেছেন :

> কলিকাতায় অবস্থানকালীন তিনবার মহাতীর্থ বুদ্ধগয়ায় বোধিপালঙ্ক ও বোধিদ্রুম পূজা-বন্দনার সুযোগ লাভ করেছিলাম। তীর্থশ্রেষ্ঠ মহাপুণ্যপ্রসূ বোধিপালঙ্কের গুণ অসাধারণ। মহাসমুদ্রে যত বালিকণা আছে ততধিক সম্যক সম্বুদ্ধ অতীতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও ততধিক সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হবেন। সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞানলাভের একমাত্র স্থান হল এ বোধিপালঙ্ক। এ ছাড়া জগতে বোধিজ্ঞান লাভের অন্যস্থান নেই। ভাবীবুদ্ধ সিদ্ধার্থের ধ্যানস্থান উরুবিল্ল পর্বত, গুহা, সুজাতার পিত্রালয়, মুচলিন্দ হ্রদ, বজ্রাসন প্রভৃতি সপ্ত মহাস্থান বন্দনা ও পূজা করি। সারনাথে গিয়েছিলাম দু'বার। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম অনাগারিক ধর্মপালকৃত মূলগন্ধকুঠি বিহারের দ্বার উদ্‌ঘাটন উৎসব মহামেলায় কলিকাতার প্রবাসী বড়ুয়াদের ডেলিগেট হয়ে।...

কলকাতার ধর্মাঙ্কুর বিহারে তিন বৎসর অবস্থানের পর এবার রেঙ্গুন থেকে আহ্বান এলো তাঁর গুরুদেবের। কর্মযোগী বিদ্যোৎসাহী প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির

তাঁর সুযোগ্য শিষ্যকে আহ্বান জানালেন রেঙ্গুনে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘশক্তি পত্রিকা, বৌদ্ধ মিশন প্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণের। ভিক্ষু শীলালঙ্কার ২৬ মার্চ রবিবার ১৯৩৩ সকাল ৯টায় কলকাতা থেকে স্টিমারযোগে রেঙ্গুন যাত্রা করেন এবং ২৮ মার্চ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন—গুরুদেবের একান্ত ইচ্ছা, তিনি দার্জিলিং ও রাজগৃহ প্রভৃতি কয়েকটা স্থান পরিভ্রমণ করে বুদ্ধগয়াতেই বর্ষাযাপন করবেন। পত্রিকা প্রকাশ, প্রেস পরিচালনা ইত্যাদি কাজে ভিক্ষু শীলালঙ্কারের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর ভরসা ভিক্ষু জ্যোতিঃপাল আছেন—তিনি প্রথম থেকেই প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সহযোগী হিসেবে রেঙ্গুনে অবস্থান করছিলেন। সকল কিছুই তাঁর জানা এবং প্রেসের কাজেও তিনি সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাঁর সাহায্য নিয়ে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবেন— ভিক্ষু শীলালঙ্কার এরূপ ধারণা করলেন।

কিন্তু তাঁর আশা ফলবতী হল না। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির রেঙ্গুন ত্যাগ করার সপ্তাহকাল পরে জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু জানালেন যে, তিনি ভাবনা করার জন্য থাটন যেতে চান। ভিক্ষু শীলালঙ্কার এতে সম্মত হলেন না। কিন্তু জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু এতে শান্ত না হয়ে কাতরভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। তাঁর পীড়াপীড়ি ও কাতর আবেদনে শেষ পর্যন্ত শীলালঙ্কার তাঁকে থাটন যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ভিক্ষু জ্যোতিঃপাল প্রতিশ্রুতি দান করলেন যে, তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্বে অবশ্যই ফিরে আসবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, কারণ এটিই ছিল তাঁর শেষ যাত্রা। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু ছিল আকস্মিক ও অভাবিতপূর্ব। ভিক্ষু জ্যোতিঃপাল থাটন গিয়েই ভাবনা শুরু করেছিলেন। তারপর একদিন একান্ত নির্জনে একাগ্রমনে ভাবনার মানসে তিনি বিহারের অনতিদূরে অরণ্যে একটি বৃক্ষমূলে বসে ভাবনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। ২৪ ঘন্টা পর তাঁকে সেখানেই পাওয়া যায় মুমূর্ষু অবস্থায়। সে অবস্থায় সেখান থেকেই তাঁকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হয়। শীলালঙ্কার মহাথেরো লিখেছেন—'বিকালে তাকে পথ্য সেবন করাবার জন্য খুব চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হয়নি। জীবন হতেও সে শীলবিশুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। বৈশাখী পূর্ণিমার সপ্তাহকাল পূর্বে আমরা তার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম।"

জ্যোতিঃপাল ভিক্ষুর অবর্তমানে শীলালঙ্কার ভিক্ষু কার্যনির্বাহে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু নিজ কর্মদক্ষতা ও পরিচালনা গুণে তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বৈশাখী পূর্ণিমার সর্বজনীন সভা ও যাবতীয় উৎসবানুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি সর্ববিষয়ে যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন তথাকার চট্টল বৌদ্ধ সমিতির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক সাতবাড়ীয়া নিবাসী মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া।

বৈশাখী পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়ার পর ভিক্ষু শীলালঙ্কার মিশনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বৌদ্ধ মিশনের মুখপাত্র 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। এ সময় ৮ জন ভিক্ষু-শ্রামণ, ৪ জন প্রেস-কর্মচারী, একজন কেরানি ও একজন দারোয়ান নিয়ে মোট ১৪ জন কর্মীর তত্ত্বাবধান করতে হতো তাঁকে। গ্রন্থমুদ্রণ প্রয়াসে তিনি প্রথমেই ভিক্ষু জ্যোতিঃপাল রচিত 'সীবলী চরিত'-এর মুদ্রণকার্য শুরু করেন এবং অল্পকাল পরেই তা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তারপর মুদ্রিত হল ভিক্ষু শীলালঙ্কারের নিজের লেখা বই 'অজাতশত্রু' এবং 'ধর্মপদার্থ কথা'।

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ এ দু'বৎসর রেঙ্গুনে অবস্থানকালে ভিক্ষু শীলালঙ্কারের পূর্বব্যাধি ক্রনিক ডিসেন্ট্রি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ সালে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য তিনি দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘ ছ'মাস ধরে চিকিৎসার ফলে রোগাক্রমণ প্রশমিত হওয়ার পর তিনি আবার 'বিমান বত্থু' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করেন। এ সময় তিনি স্বগ্রামে আনন্দধাম বিহারে অবস্থান করছিলেন। পঞ্চমবর্গের অনুবাদকার্য শেষ হওয়ার পর গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহ্বানে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি সহ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর আবার রেঙ্গুন যাত্রা করেন। মিশন কর্মক্ষেত্রে পৌঁছার পর অবশিষ্ট অংশ অনুবাদের কাজ শেষ করেন তিনি। অতঃপর ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে বইটির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহার এবং বৌদ্ধ মিশনের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ভিক্ষু শীলালঙ্কার জীবকের জীবন কাহিনী রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ সালের মে মাসে এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। অতঃপর ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে তিনি যথাক্রমে 'বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ নারী' এবং 'বিশাখা' নামক পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই সময়ে রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহার ও বৌদ্ধ মিশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চট্টল বৌদ্ধ সমিতির সাথে মামলা-মোকদ্দমার

ফলে তিনি নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। অনিবার্য কারণে সে সময় বৌদ্ধ মিশন প্রেস রেঙ্গুন শহরের লুইস স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করতে হয়। এরপর ১৯৪১ সালের ২১ মে শীলালঙ্কার একরূপ বাধ্য হয়ে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ভিক্ষু শীলালঙ্কার চট্টগ্রাম ফিরে আসার ছয় মাস পর রেঙ্গুন শহরে জাপানিদের বোমারু বিমানের আক্রমণে বৌদ্ধ মিশন প্রেস বিধ্বস্ত হয়। প্রেসে রক্ষিত যাবতীয় সম্পদ ও কাগজপত্র এ সময় ধ্বংস হয়ে যায়। ভিক্ষু শীলালঙ্কার ১৯৩৩ সালের ১১ মে থেকে ১৯৪১ সালের ২১ মে পর্যন্ত সুদীর্ঘ আট বৎসর 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকায় বৌদ্ধ সমাজের আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি সহ ধর্ম ও ঐতিহ্য বিষয়ক নানা রচনা প্রকাশিত হয়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ভিক্ষু শীলালঙ্কার 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও বৌদ্ধ মিশনের সম্পাদক, ধর্মদূত বিহারের চারজন পরিচালকের অন্যতম পরিচালক, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য এবং মিশনের প্রকাশনাসমূহের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন বোর্ড-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালে বৌদ্ধ মিশন মোট ৩৮টি বই প্রকাশ করে। এর মধ্যে 'ত্রিপিটক'-এর কয়েকটি খণ্ডের বঙ্গানুবাদও ছিল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবী দেবপ্রিয় বড়ুয়া এ প্রসঙ্গে তাঁর His Holiness Sangharaj Shilalankar Mahataero : A Short Biography বইটিতে লিখেছেন :

> ....he was entrusted with the challenging responsibilities of Seceretary of the Buddhist. Mission which was founded in 1928 by his preceptor Aggamahapandita Prajnalok Mahathero to propagate Buddhism through publication of Buddhist books, particularly translation of the sacred Tripitaka volumes in Bengali, setting up Pali institutions, libraries, charitable institutions and promoting missionary work for dissemination of the teachings of the Buddha. Bhikkhu Shilalankar as secreatary of the Buddhist Mission employed his organising abilities for running the printing press of the Mission and contributed in the implementation of noble

undertakings launched by the Mission. His talent came into full play and it was no wonder that he rolled into himself the functions of the Editor of `Shanghasakti', Seceretary of the Buddhist Mission, one of the four directors of the Dhammoduta Vihar, member of the Advisory Board and member of the five-man selection board for publication of Mission books. It was really a very stupendous job but he accomplished all these responsibilities with care, diligence, devotion and missionary spirit for more than eight years until the middle of 1941. During his tenure, the Buddhist Mission published a total of 38 books on Buddhism including volumes of Tripitaka in Bengali; and circulated them at cheap price throughout the whole of Burma and sub-continent among the Bengali-speaking Buddhists and other pepole. Despite all these intense pre-occupation he did not abandon his writing habit and wrote books, Jivaka (91 pages), Visakha- (152 pages) and Bouddha Yage Bouddha Nari (Buddhist women in Buddha's times).

চট্টগ্রাম ফিরে এসে ভিক্ষু লীলালঙ্কার তাঁর স্বগ্রাম নানুপুরেই অবস্থান করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মাহযুদ্ধের কালো ছায়া তখন শহর-বন্দর গ্রাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার শুরু হল। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষাবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠল। নিরন্ন মানুষের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। শীলালঙ্কার তাঁর সামান্য শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন মানুষের দুঃখলাঘবের জন্য। সরকারি সাহায্য বিতরণে তাঁর যথোচিত দায়িত্বও তিনি পালন করতে লাগলেন। এদিকে হিঙ্গলাবাসীরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের গ্রামের বিহারের বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে যাওয়ার জন্য। শীলালঙ্কার ভিক্ষু তাঁদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৪৬ সালের ৩ জুলাই (১৮ আষাঢ় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) বুধবার শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে হিঙ্গলা গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাউজান থানাধীন হিঙ্গলায় ছ'বৎসরকাল অবস্থান করে তিনি সদ্ধর্মের প্রচার এবং ধর্ম ও বিনয় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভিক্ষু শীলালঙ্কার ছিলেন উদ্যোগী কর্মবীর। ধর্ম-বিনয়ের পাশাপাশি গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি

সেখানে 'পল্লী উন্নয়ন সমিতি' গঠন করেন। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো গঠনমূলক উন্নয়ন কাজের জন্য নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজন।

বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারে অবস্থান

হিঙ্গলায় ছ'বৎসর অতিবাহিত করার পর ভিক্ষু শীলালঙ্কার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া গ্রামের বিহারে বিহারাধ্যক্ষ পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। তিনি ১৯৫২ সালের ৩ জুলাই (১৯ আষাঢ় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারে উপনীত হন। সেদিন তিনি নিজেও জানতেন না—এই শাক্যমুনি বিহারেই ১৫ বৎসর তিনি থাকবেন। মির্জাপুরস্থ শান্তিধাম বিহারের পরই বৈদ্যপাড়ায় তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকাল। বৈদ্যপাড়া সম্পর্কে খুব অল্প কথায় শীলালঙ্কার মহাথেরো লিখেছেন :

> বৈদ্যপাড়ার লোক শিক্ষিত, ভদ্র ও মার্জিতরুচি সম্পন্ন। এখানকার পরিবেশ আমার জীবনকে করেছিল নবজীবনে রূপায়িত এবং মনোজগতকে করেছিল সমুজ্জ্বল। মণিকাঞ্চন সংযোগ হওয়ার মত সম্মিলিত হয়েছিল পুরাতত্ত্ব অনুশীলি বাবু উপেন্দ্র লাল বড়ুয়া, ডাক্তার রাসবিহারী চৌধুরী, ভিক্ষু রাষ্ট্রপাল, প্রবীন পণ্ডিত মোহিনী মোহন বড়ুয়া, শাকপুরার বুদ্ধনন্দন বড়ুয়া, জ্ঞানশ্রী স্থবির, সুসাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া ও শিক্ষক ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া। এ মহদাশয় ব্যক্তিগণ—সর্ববিষয়ে সাহায্য করে আমার কর্মসাধনা তথা সাহিত্য সাধনার পথে আমাকে দ্রুত আগুয়ান করিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কল্যাণমিত্রের মহদুপকার স্মরণেও মন প্রসন্ন হয় এবং কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরপুর হয়।

ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড প্রতিষ্ঠা

বৈদ্যপাড়ার শাক্যমুনি বিহারে অবস্থানকালে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে শীলালঙ্কার মহাথেরো তাঁর সাহিত্যকর্মে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ১৯৫৯ সালে জিনবংশ স্থবির লিখিত 'সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য' ও 'প্রেতকাহিনী' নামক সুবৃহৎ দুটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেন তিনি ছয় মাস ধরে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে একদিন শ্রীমৎ রাষ্ট্রপাল ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপকালে তিনি বুদ্ধসেবক আনন্দের জীবন সম্পর্কে অনেক বিষয়

আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু ভদন্ত শীলালঙ্কারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত ও আনন্দিত হন। অতঃপর তিনি ভিক্ষু শীলাঙ্কারকে বুদ্ধসেবক আনন্দের জীবনকথা নিয়ে একটি বই লিখতে অনুরোধ জানান। তখন শীলালঙ্কার মহথেরো আনন্দের জীবনকাহিনী লিখতে শুরু করেন। তবে প্রথমে বিবিধ গ্রন্থ থেকে তাঁর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন তিনি। এ কাজে প্রায় পাঁচ মাস সময় লেগেছিল তাঁর।

রেঙ্গুনের বৌদ্ধ মিশন প্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টতার কারণে শীলালঙ্কার মহথেরো গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশ বিষয়ে সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। ধর্ম-বিনয় বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে চিরজাগরূক ছিল বলেই তিনি বৈদ্যপাড়ায় শাক্যমুনি বিহারে অবস্থানকালে 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কাজে তাঁর সহায় ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির। ১৯৬৪ সালের ২৩ জুলাই (১৩৭১ বঙ্গাব্দের ৭ শ্রাবণ) বৃহস্পতিবার আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বোর্ড-এর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৭১ বাংলায়। সেটি ছিল শীলালঙ্কার মহথেরো রচিত 'বিশাখা'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'জীবক' ও 'বৌদ্ধ নীতি মঞ্জরী' নামক দুটি বই। পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হয় শীলালঙ্কার মহাথেরো রচিত অপর একটি বই 'আনন্দ'। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে 'পারমিতা' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' থেকে ১২টি বই প্রকাশিত হয়েছিল।এর মধ্যে ৬টি ছিল শীলালঙ্কার মহথেরো রচিত। তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৬ সালে 'সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা' তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রদান করেন।

শাক্যমুনি বিহারে অবস্থান করার সময় শীলালঙ্কা মহাথেরো একবার মহসমারোহে 'অটঠপরিক্খার' দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে সংঘদান করতেন। তাঁর এই দানচেতনা সারাজীবন তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা গেছে। শাক্যমুনি বিহারে উপর্যুক্ত দানানুষ্ঠান আয়োজন প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা নিম্নরূপ :

> সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষের দিন চলে যায়। সেরূপ আমারও দিন চলে যেতে লাগল। অনন্তর এক সময় আমার প্রবল দান চেতনা উৎপন্ন হল। মহাপুণ্যপ্রসূ 'অটঠপরিক্খার' (উপসম্পদার উপযোগী চীবর-পাত্র ইত্যাদি আট

প্রকার উপকরণ) দান করবার ইচ্ছা পোষণ করলাম। এ দান যেন বহুবিধ উপকরণ সমন্বিত ও জাঁকজমকপূর্ণ হয় ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তজ্জন্য আমি প্রস্তুত হতে লাগলাম। ছ'মাস যাবৎ এ প্রস্তুতি চলল। তারপর আমার মনোভাব প্রকাশ করলাম। দানোৎসবের তারিখও নির্দিষ্ট হল। ১৯৫৮ ইং নভেম্বর মাস, ১৩৬৫ বাংলার ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার। বৈদ্যপাড়া, করলডাঙ্গা ও সারোয়াতলী এ তিন গ্রামের বড়ুয়াদের আহ্বান করে পরামর্শ করা হল। উক্ত তিন গ্রামের লোকের পূর্ণ সহায়তায় এ মহাদানযজ্ঞ অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। বৈদ্যপাড়া ও অন্যান্য দেশবাসী যথেষ্ট দানীয় সামগ্রী ও অর্থ দান করে এ দানযজ্ঞকে আশাতীত সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিল।

শীলালঙ্কার মহাথেরো তাঁর আত্মচরিত 'আমার জীবনকথা'র পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, এ মহাদান আয়োজিত হয়েছিল অতীত অনাগত অনন্ত বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ–আর্যসংঘ ও সম্মতি সংঘের উদ্দেধে। উক্ত মহাসংঘদান-সঙ্ঘপূজায় অগণিত দানীয় সামগ্রী দান করা হয়। তন্মধ্যে সংঘরাজ যেগুলির হিসাব লিখে রেখেছিলেন তাতে ১২৩ প্রকার দানীয় সামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে।

শান্তিধাম বিহারে আগমন

১৫ বৎসর বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারে অবস্থানের পর ১৯৬৭ সালের ১৪ জুন (১৩৭৪ বাংলার ৪ঠা আষাঢ়) সোমবার অপরাহ্ণে সাড়ে চারটার সময় বৈদ্যপাড়াবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শীলালঙ্কার মহাথেরো মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে চলে আসেন। বৈদ্যপাড়া ছেড়ে চলে আসার প্রধান কারণ ছিল যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা। এ সময় ত্রিপিটক প্রচার বোর্ডের পুস্তকাদি মুদ্রণ ও বিভিন্ন কাজ উপলক্ষে তাঁকে প্রতি সপ্তাহে ২/১ বার চট্টগ্রাম শহরে যাতায়াত করতে হত। সে সময়ে বর্তমানকালের মতো গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে চলাচলের সুব্যবস্থা ছিল না। চট্টগ্রাম আসার জন্য বৈদ্যপাড়া থেকে আড়াই মাইলেরও অধিক পথ হেঁটে এসে বেঙ্গুরা স্টেশনে ট্রেন ধরতে হত। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই পথ অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ছিল। তখন তাঁর অনেক বয়সও হয়েছে। তাই তিনি শহরের কাছাকাছি কিংবা শহরের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল এমন একটি স্থান খুঁজছিলেন। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু তাঁকে মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারের কথা জানান। জ্ঞানশ্রী ভিক্ষুর কাছে সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিয়ে শীলালঙ্কার মহাথেরো একদিন শান্তিধাম বিহারের অবস্থা

দেখে গেলেন। বিহার থেকে 'সরকার হাট' রেলস্টেশন তেমন দূরে নয়। চট্টগ্রাম–নাজিরহাট শাখা লাইনে নিয়মিত রেল চলাচল করে। শীলালঙ্কার মহাথেরো তাঁর অবস্থানের জন্য শান্তিধাম বিহারকে পছন্দ করলেন। কিন্তু মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে আসতে তাঁর আরও এক বৎসর বিলম্ব হয়েছিল। প্রধানত বৈদ্যপাড়ার দায়ক-দায়িকাদের অনুরোধ রক্ষার্থেই তিনি আরও এক বৎসর সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

মির্জাপুর গ্রামে দুটি বিহার। একটি শান্তিধাম বিহার, অপরটি গৌতমাশ্রম বিহার। শান্তিধাম 'পুরান বিহার' নামে পরিচিত। এ বিহারে স্মরণাতীত কাল থেকে একটি ছোট বুদ্ধমূর্তি ছিল। সাধারণ্যে বিশ্বাস যে, এ ছোট বুদ্ধমূর্তিটি দৈবশক্তিতে প্রভাবান্বিত। এজন্য বিভিন্ন স্থান থেকে বৌদ্ধ-হিন্দু জনসাধারণ তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ বুদ্ধমূর্তির পূজার মানত পূরণের জন্য এখানে আসতেন।

শান্তিধাম বিহারের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো সন্ধান না থাকলেও স্থাপত্যের বিচার থেকে কমপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর নির্মাণবৈশিষ্ট্যধারী বলে মনে করা হয়। মি: ডি. পি. বড়ুয়া তাঁর His Holiness Sangharaj Shilalankar Mahathero : A Short Biography বইটিতে লিখেছেন :

> Its architectural pattern and brickwork suggest it to be quite ancient at least dating back to 16th century. A small Buddha image of miniature size in this ancient monestry is believed to be invested with miraculous powers as the 'Old Lord'.

শীলালঙ্কার মহাথেরো যখন শান্তিধাম বিহারে অবস্থান করার জন্য আসেন তখন দীর্ঘকাল ধরে সংস্কারকার্যের অভাবের ফলে বিহারের জীর্ণ দশা। শীলালঙ্কার ভিক্ষু তাঁর চিরাচরিত কর্মোদ্যোগ নিয়ে নতুন উৎসাহে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ মানসে কাজ শুরু করেন। কাজে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি একটি আবেদনপত্র এবং রসিদ বই ছাপিয়ে অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই (১৩৭৪ বাংলার অগ্রহায়ণ মাস)। অতঃপর ১৩৭৬ বাংলার ২৫ ফাল্গুন সোমবার শান্তিধাম বিহার প্রাঙ্গণে 'মূলগন্ধকুটি' নামক মন্দির নির্মাণকল্পে ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ

মন্দিরের মাটি খননের কাজ শুরু করা হয় ১৩৭৭ বাংলার ১৭ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী শুভ তিথিতে। মন্দির নির্মাণের কাজ যথারীতি চলতে থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ায় তা বাধাপ্রাপ্ত হলে পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এর নির্মাণকার্য সমাধা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা মির্জাপুর গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল। শান্তিধাম বিহারের পশ্চিমে অবস্থিত হিন্দুবাড়িসমূহসহ এলাকার সকল হিন্দুবাড়ি এবং কয়েকখানা বড়ুয়াবাড়ি তারা লুণ্ঠন করে এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভিক্ষু শীলালঙ্কার সেদিন পূর্বাহ্নে বিহার তালাবদ্ধ করে পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুমানমর্দনে চলে গিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে তাঁর আবাসস্থান বিহারও লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনকারীরা প্রায় এক হাজার আটশত টাকা মূল্যের জিনিস বিহার থেকে নিয়ে যায়।

থাইল্যান্ড সফর

১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো তিন-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে থাইল্যান্ড সফরে যান। প্রতিনিধি দলের অপর দু'জন সদস্য ছিলেন সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের তৎকালীন সহ-সভাপতি শ্রীমৎ শান্তপদ মহথেরো এবং চট্টগ্রামে আজাদী পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া। এর পূর্বে ১৯৭৪ সালের ১ জুলাই সপ্তম সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের পর উপ-সংঘরাজ শীলালঙ্কার অষ্টম সংঘরাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি যখন থাইল্যান্ড ভ্রমণে যান তখন থাইল্যান্ডে তাঁর ১৮ দিন ব্যাপী ভ্রমণকালে তাঁকে 'বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৌদ্ধ ধর্মগুরু' হিসেবে যথাযথ রাষ্ট্রাচারের (রাষ্ট্রীয় প্রটোকল) মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর মির্জাপুর গৌতমাশ্রম বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শান্তপদ মহথেরো উক্ত বিহারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্ককের ধর্মমঙ্গল মহাবিহারের অধ্যক্ষ ফরা জ্ঞানবীরিয়কে বুদ্ধের পূতাস্থি উপহার প্রদান করেছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানেই ফরা জ্ঞানবীরিয় থাইল্যান্ড সফরের জন্য শীলালঙ্কার মহাথেরোকে আমন্ত্রণ জানান। সংঘরাজ থাইল্যান্ড সফর করেন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে, থাইল্যান্ড সরকারের

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রণীত কর্মসূচী অনুযায়ী।

সংঘরাজের থাইল্যান্ড সফরকালে থাইল্যান্ডের রাজা অতুল্যদেব ভূমিবল ১২ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে রাজধানী ব্যাঙ্কক থেকে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ চেং মাই নগরীতে তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে সংঘরাজকে অভ্যর্থনা জানান। থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে সংঘরাজ শীলালঙ্কার ও তাঁর প্রতিনিধি দলকে পবিত্র বুদ্ধধাতু উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানান। সংঘরাজ শীলালঙ্কার বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয় রাজাকে অবহিত করেন। তিনি 'ভবতু সব্বমঙ্গলম' উচ্চারণ করে বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী রাজাকে আশীর্বাদ জানান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ থেকে প্রদত্ত বুদ্ধধাতু সংরক্ষণের জন্য ব্যাঙ্ককের ওয়াট ধর্মমঙ্গলে একটি আকাশচুম্বী স্তূপ নির্মাণ করা হয়। এই স্তূপের নয় তলায় পবিত্র বুদ্ধধাতু সংস্থাপন করা হয়। উক্ত স্থানের বৃত্তাকার দেওয়ালে বুদ্ধধাতু উপহার প্রদানের দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করা হয়েছে। এইসব চিত্রে সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো , শান্তপদ মহাথেরো এবং ফরা জ্ঞানবীরিয় ফ্রেস্কো স্থায়ী ফ্রেমে চিত্রিত হয়ে আছেন।

থাইল্যান্ডে ১৮ দিনের সফরকালে সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো থাইল্যান্ডের সংঘরাজ সেমেদিস আরিয়াবংশ কাতায়নের সঙ্গে তাঁর আবাসিক বৌদ্ধবিহারে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দুজনে সে সময় অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে পালি ভাষায় আলাপ-আলোচনা করেন। এই সময়ে সংঘরাজ থাই সুপ্রিম সংঘ কাউন্সিলের একটি সভায়ও যোগ দেন।

থাইল্যান্ড ভ্রমণ সংঘরাজের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। প্রতিরূপ দেশে সদ্ধর্মের যথোচিত অনুসরণ এবং থাইল্যান্ডবাসীদের ধর্মপ্রাণতা তাঁকে অভিভুত করেছিল। তিনি লিখেছেন :

> আমার জীবনব্যাপী শুনে আসছি এই রমণীয় প্রতিরূপ দেশের প্রীতিপদ যশঃকীর্তির কথা, বুদ্ধশাসনের বিশুদ্ধির কথা, বিদ্বজ্জন পরিশোভিত শাসন প্রধান এই অপূর্ব দেশের কথা, সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুসংঘ ও উপাসক-উপাসিকাদের কথা, ন্যায়নিষ্ঠ সদ্ধর্মবৎসল রাজার কথা, নৈর্বাক্তিক সত্যধর্মের প্রতি গৌরবতার কথা, সুন্দর সুশৃঙ্খলাপূর্ণ যথাধর্মানুশাসিত এই পুণ্যস্নাত থাইল্যান্ডের কথা, সুদৃঢ়-সুমার্জিত বিনয়বিধি পরিশোভিত নিকায় এবং শীলভূষণে বিভূষিত ভিক্ষুসংঘের কথা। শুনে শুনে মনপ্রাণ প্রসন্নতায় ভরে ওঠে, শ্রদ্ধায় অন্তর নমিত হয়ে পড়ে।

এই অপূর্বদর্শন, মনোহর দেশ দেখবার প্রবল ইচ্ছা বারবার অন্তরে জাগ্রত হচ্ছে। আমার চিরবাঞ্ছিত পুণ্যতীর্থ আজ সন্দর্শন করে আনন্দে অভিভূত হয়েছি। মনে হচ্ছে—এদেশবাসী আমার সতীর্থ, স্বগোত্র-স্বজাতি। এদেশে এসে আমার জ্ঞাতিভাইদের সঙ্গে যেন মিলিত হয়েছি।

থাইল্যান্ডের প্রতি সংঘরাজের এরূপ আকর্ষণ ও নৈকট্যানুভবের দুটি কারণ ছিল। সেটি তাঁর কথাতেই জানা যেতে পারে :

আমাদের বাল্যকালে 'হস্তসার' নামক একটা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলাম। তা আমাদের দেশে অতি প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত পুস্তক। এতে সানুবাদ বন্দনাগাথা ও মঙ্গলরত্নসূত্রাদি বহু সূত্র সংগৃহীত হয়েছে। এটার লেখক—পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া। আমাদের দেশে আমরা 'বড়ুয়া' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে থাকি। পণ্ডিত ধর্মরাজের পরিচয় নিয়ে জ্ঞাত হলাম—ইনি শ্যামরাজ্যে গিয়ে পণ্ডিত হয়ে এসেছেন। তখন আমার মনে হয়েছিল—শ্যামরাজ্য পণ্ডিতজন পরিশোভিত সুধন্য দেশ। সেখানে যাঁরা গমন করেন তাঁরাই পণ্ডিত হয়ে আসেন। তখন থেকেই শ্যামরাজ্যের প্রতি আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং এ দেশ দর্শনের প্রচণ্ড আগ্রহ উৎপন্ন হয়েছিল।

১৯৩০ ইংরেজীতে আমার কলিকাতা অবস্থানকালীন শ্যামরাজ্য থেকে সুন্দর বাঁধাই করা ত্রিপিটকের সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থের একটা পেক্ করা বড় বান্ডিল তত্রস্থ বড়ুয়াদের ধর্মাঙ্কুর বিহারে পৌঁছেছিল। জানতে পারলাম—এসব গ্রন্থ শ্যামরাজের দান। তাঁর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থ মুদ্রিত করে সমগ্র বৌদ্ধরাজ্যে ও পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে দান করছেন। তখন মহারাজ ধর্মাশোকের কথা আমার মনে পড়ল। শ্যামরাজের এ অবিস্মরণীয় পুণ্যাবদান এখনও আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে অনাবিল প্রীতি ও প্রসন্নতায় অন্তর ভরে ওঠে। তিনি ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেও কিন্তু তাঁর অমর কীর্তি চিরদিন জগতে বিঘোষিত হবে। তখন হতে এদেশের বুদ্ধশাসন হিতৈষী সদ্ধর্মনিষ্ঠ রাজার প্রতি ও এই প্রতিরূপ দেশের প্রতি আমার প্রবলতর শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা ও আন্তরিকতার সঞ্চার হয়।

থাইল্যান্ড থেকে ফেরার পর সংঘরাজ শীলালঙ্কার আবার নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাতবাড়িয়া শান্তি বিহারে সপ্তম সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের পূতদেহ সৎকার করা হয়। পূর্বরাত্রে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে শীলালঙ্কার মহাথেরোকে অষ্টম

সংঘরাজ হিসেবে বরণ করা হয়। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যোগদান করেছিলেন তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী কোরবান আলী। বিদেশী বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে যোগদান করেছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত।

এ অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পরে পটিয়া থানাধীন উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারে লোকান্তরিত বিদর্শনাচার্য জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাতাপসের মরদেহ সৎকার উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শোকসভায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যোগদান করেছিলেন তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী। বিদেশী বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে যোগদান করেছিলেন মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মহানায়ক থেরো এন. জিনরতন। সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো এ মহতী সভায় সমস্ত ভিক্ষুসংঘের পক্ষ থেকে বাণী পাঠ করেন।

এর পরে মার্চ মাসে মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে সংঘরাজের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষে মহাসংঘদান, অষ্টপরিষ্কারদানসহ মহতী দানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘরাজের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উভয় নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকাগণ যোগদান করেন। সেদিন সমগ্র মির্জাপুর জনপদ উৎসবমুখর আনন্দপুরীতে পরিণত হয়েছিল। এ অভিষেক অনুষ্ঠানের পর সংঘরাজকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন বিহারে সাড়া পড়ে যায়। এর মধ্যে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ৫ মে তারিখে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা জাতীয় কেন্দ্রের উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংঘরাজ শীলালঙ্কার এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ।

দ্বিতীয়বার থাইল্যান্ড ভ্রমণ

১৯৭৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে সংঘরাজ শীলালঙ্কার দ্বিতীয়বার থাইল্যান্ড সফরে গমন করেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত

বুদ্ধের পবিত্র কেশধাতু থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককস্থ ওয়াট ধর্মমঙ্গলে উপহার প্রদান। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম নন্দনকানন বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথেরো, বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, কার্যকরী সভাপতি হেমেন্দ্রলাল বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক কিরীটি বিকাশ বড়ুয়া প্রমুখ। ৩রা মার্চ ধর্মমঙ্গল বিহারে এক উৎসবানুষ্ঠানে সংঘরাজ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেশধাতু রক্ষিত সুবর্ণাধারাটি হস্তান্তর করেন। পরদিন থাই প্রধানমন্ত্রী ধর্মমঙ্গল বিহারে এক হাজার ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করেন। এদিন পূর্বাহ্নে সুমতি তাসাপাইবুল নামে একজন শ্রদ্ধাবান উপাসক সংঘরাজ শীলালঙ্কারকে ৯ ফুট উচ্চ অষ্টধাতু নির্মিত একটি মহামূল্যবান সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি উপহার প্রদান করেন।

এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে যোগদান

থাইল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর সংঘরাজ শীলালঙ্কার এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা—জাতীয় কেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতরে অনুষ্ঠিতব্য পঞ্চম এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালের ১৪ জুন পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে সংঘরাজ উলনা বাতরের পথে বিমানে মস্কো যাত্রা করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন—দেবপ্রিয় বড়ুয়া (বিকল্প নেতা), বিজয়শ্রী বড়ুয়া, বিমলেন্দু বড়ুয়া ও ব্রহ্মদত্ত বড়ুয়া। ঢাকা থেকে দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা বিরতিহীন যাত্রা শেষে তারা ১৫ জুন পূর্বাহ্নে মস্কো বিমান বন্দরে পৌঁছান। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৌদ্ধ ধর্মীয় কাউন্সিলের ভিক্ষু ও কর্মকর্তারা বিমান বন্দরে সংঘরাজকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে তাঁরা আবার দশ ঘণ্টা বিমানযাত্রার পর ১৬ জুন সকালে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতরে পৌঁছান। ১৬ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংঘরাজ শীলালঙ্কার সম্মেলনের প্রেসিডিয়াম তথা সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং সম্মেলনকালে মূল মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে তিনি সম্মেলন পরিচালনা করেন। প্রতিনিধিদলের বিকল্প নেতা দেবপ্রিয় বড়ুয়া এ সময় মঞ্চে সংঘরাজের পাশে উপবিষ্ট হয়ে ইংরেজিতে তাঁর বক্তব্য অনুবাদ

করেন। এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে যোগদানের বিবরণ প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বড়ুয়া লিখেছেন (শতাব্দীর সূর্য সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথের—সৌগত ৫ম বর্ষ, ১২ অক্টোবর ২০০০ সংঘরাজ শীলালঙ্কার সংখ্যা) :

এশিয়া মহাদেশের বৌদ্ধদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংঘরাজ শীলালঙ্কারের সভাপতির দায়িত্ব পালন একটি অসাধারণ সম্মান। সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সংঘরাজ শীলালঙ্কার এবিসিপি'র সভাপতি মঙ্গোলীয়ার শীর্ষতম বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু হাম্বোলামা গম্বোজাভ, সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর জুগদার, জাপানের শান্তিবাদী বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু নিচিদাতসু ফুজিগুরু, জাপান এবিসিপি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সুজন মিবো, প্রখ্যাত শান্তিবাদী জাপানি ধর্মীয় গুরু নাকানো, ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় গুরু কুশক বকুলজী, রাশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান হাম্বোলামা গম্বোয়েভ, শ্রীলংকার বৌদ্ধ কংগ্রেসের সভাপতি বিপুলসার নায়কথের সহ থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, নেপাল প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সাথে সরাসরি কথা বলে মতবিনিময় করেন এবং বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন। এই সম্মেলনে আগত বুদ্ধের শান্তি ও অহিংসার বাণী অবলম্বনে শান্তির কাজে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য এশিয়ায় শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ নেতাদের সাথে বাংলাদেশ এবিসিপি জাতীয় কেন্দ্রের সভাপতি জ্যোতিঃপাল মহথেরকে 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি স্বর্ণপদকে' সনদপত্র সহ ভূষিত করা হয়। সংঘরাজ শীলালঙ্কার এই স্বর্ণপদক জ্যোতিপাল মহাথেরো পক্ষে বিপুল করতালির মধ্যে এবিসিপি সভাপতির কাছ থেকে গ্রহণ করেন।...

মঙ্গোলীয়া থেকে ফেরার পথে ১৯৭৯ সালের ২৩ জুন রাশিয়ার বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু হাম্বোলামা গম্বোয়েভের আমন্ত্রণে সংঘরাজ শীলালঙ্কার প্রতিনিধি দলসহ রাশিয়ার বুরিয়াত অঞ্চলের রাজধানী উলান-উদের অদূরবর্তী ইভলগিনস্কী সংঘারামে পৌছান। ... ইভলগিনস্কী সংঘারামের বিরাট এলাকা জুড়ে মূল মন্দির, যাদুঘর, আন্তর্জাতিক অতিথিশালা, লাইব্রেরী অবস্থিত। দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় অবস্থানকালে শত শত বৌদ্ধ নরনারী তাঁকে দেখার জন্য সমবেত হন এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এ সময়ে বিভিন্ন দেশের ২৮ জন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা মঙ্গোলীয়ায় এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন থেকে ফেরার পথে এই মন্দিরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান হাম্বোলামা গম্বোয়েভ বিদেশী অতিথিদের সম্মানে যে সংবর্ধনা দেন তাতে বাংলাদেশের সংঘরাজ শীলালঙ্কারকে প্রধান অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়।

রাশিয়ার প্রবীণ বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু হাম্বোলামা গম্বোয়েভ বাংলাদেশ ও রাশিয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য সংঘরাজ শীলালঙ্কারের সর্বপ্রথম এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। সংঘরাজ শীলালঙ্কারের বাংলা ভাষায় প্রদত্ত অনুপম বক্তৃতা আমি ইংরেজিতে তর্জমা করেছিলাম এবং তাতে তিনি বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বর্ণনায় রাশিয়ার বৌদ্ধদের সাথে ধর্মীয় বন্ধন ও মৈত্রী স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সেখানে দুদিন অবস্থানের পর দীর্ঘ আট ঘণ্টার বিমানযাত্রায় মস্কো পৌছলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৌদ্ধ ধর্মীয় কাউন্সিলের আতিথেয়তায় সংঘরাজ প্রতিনিধি দলসহ দুদিন সেখানে অবস্থান করেন। সে সময় তিনি ক্রেমলিন প্রাসাদ, রেড স্কোয়ার, সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম মস্কোর বিখ্যাত ঘণ্টা, লেনিন মিউজিয়ামসহ বিশাল মস্কো নগরী পরিভ্রমণ করেন।

দেশে ফিরে আসার পরে জ্যোতিঃপাল মহথেরোকে এবিসিপি'র শান্তিপদক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদানের জন্য সংঘরাজ নিজে শান্তিধাম বিহারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংঘরাজের সাধনপীঠ শান্তিধাম বিহারের পাকা দালান এবং সুউচ্চ প্যাগোডা সম্বলিত মূলগন্ধকুঠি মন্দিরের নির্মাণকাজ সমাপ্তি উপলক্ষে ১৯৭৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংঘরাজ স্বয়ং এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত শান্তিপদক ও সনদপত্র শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহথেরকে অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে তাঁকে একটি মানপত্রও দেওয়া হয়।

মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে ঢাকায় বৌদ্ধদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ বিহার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ঢাকাবাসী ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ। প্রথমে ঢাকার মালিবাগ ও পরে মোমেনবাগে যথাক্রমে তিনটি ভাড়া করা গৃহে এ সময় শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির এবং তাঁর শিষ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অবস্থান করে বিহার প্রতিষ্ঠার কাজ সূচিত করেছিলেন। ১৯৮০ সালের ৯ নভেম্বর উক্ত বিহার প্রতিষ্ঠাকামী দায়ক-দায়িকাদের উদ্যোগে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী স্কুল প্রাঙ্গণে কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংঘরাজ শীলালঙ্কার এ মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সরকারের নিকট রাজধানী

ঢাকায় থেরবাদী বিহার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বাংলাদেশের তদানীন্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংঘরাজ শীলালঙ্কার তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস উপস্থাপন করে স্বতন্ত্র বিহার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সরকারের নিকট জমি প্রদানের আবেদন জানান।

উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন পর ১৯৮০ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুর থেকে আনীত বোধিচারা রোপণ উৎসবে সংঘরাজ শীলালঙ্কার সভাপতিত্ব করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় এবং বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তদানীন্তন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ও বোমাং রাজা অং সোয়ে প্রু চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির এক প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় মর্যাদায় শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষের এই বোধিচারা চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিলেন।

হীরক জয়ন্তী উৎসব

১৯৮১ সালের ৮ মার্চ মির্জাপুর শান্তিধাম বিহার প্রাঙ্গণে সংঘরাজ শীলালঙ্কারের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ব্যাংককের ওয়াট ধর্মমঙ্গলের প্রধান ভিক্ষু ফরা জ্ঞানবীরিয়ের নেতুত্বে ২২ সদস্য বিশিষ্ট থাই বৌদ্ধ প্রতিনিধি দল এ উৎসবে যোগ দেন। ভারতের পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়া থেকে আন্তর্জাতিক ধ্যানকেন্দ্রের সভাপতি ড. রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংঘরাজকে শ্রদ্ধা জানান। উৎসবানুষ্ঠানে থাইল্যান্ড সংঘ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে থাই ভাস্কর্য খচিত একটি অনুপম বুদ্ধমূর্তি সংঘরাজকে উপহার দেওয়া হয়। বার্মা সরকারের পক্ষ থেকে সংঘরাজকে বৌদ্ধ ধর্মীয় সরঞ্জাম উপহার প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বার্মা, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতগণ সংঘরাজের প্রতি শ্রদ্ধাভিনন্দন জানান। ব্যাংককস্থ বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের সদর দপ্তরও সংঘরাজের প্রতি শ্রদ্ধাভিনন্দন জানান। এ উপলক্ষে সংঘরাজ শীলালঙ্কারের

একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ডি. পি. বড়ুয়া রচিত His Holiness Sangharaj Shilalankar Mathero : A short biography প্রকাশ করা হয়।

জাপান ভ্রমণ

সংঘরাজের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে জাপান ভ্রমণ। জাপানের শীর্ষ বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু জাপান বুদ্ধ সংঘের সভাপতি নিচিদাফুসু ফজিগুরুর আমন্ত্রণে সাধারণ ও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব ধর্মীয় কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে উক্ত সম্মেলনে যোগদানকারী তিন-সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের অপর দুইজন সদস্য ছিলেন এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা (এবিসিপি) বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের সেক্রেটারি জেনারেল ডি. পি. বড়ুয়া এবং এবিসিপি জাতীয় কেন্দ্রের সমাজকল্যাণ সম্পাদক শ্রীমতী করুণা বড়ুয়া। ১৯৮১ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত টোকিওতে অনুষ্ঠিত চারদিনের এ সম্মেলনে পাঁচটি মহাদেশের ৬০টি দেশ থেকে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন, জোরাস্ত্রিয়ান ও শিখ ধর্মের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

টোকিওর সম্মেলন শেষে সংঘরাজ শীলালঙ্কার জাপানের প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু নিচিরেন মহাবোধিসত্ত্বের ৭০০-তম জন্মবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেন। এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল টোকিও থেকে প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্তী কামাগুয়া শহরের নিকটবর্তী সুউচ্চ মাউন্ট কিয়োসুকি পর্বতশীর্ষে এক প্রাচীন সংঘারামের ছায়াসুনিবিড় বিশাল প্রাঙ্গণে। নিচিরেন মহাবোধিসত্ত্বের ৭০০-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রায় ৫০০জন বিদেশী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এশিয়ার বৌদ্ধদের পক্ষে বক্তৃতা প্রদানের বিরল সম্মান লাভ করেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার। পাঁচ মিনিটের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংঘরাজ শীলালঙ্কার তাঁর সহজাত সাবলীল অথচ অনুষ্ঠানোপযোগী মন্দ্রিত বাক্যবিন্যাসসমৃদ্ধ বাংলায় নিচিরেন মহাবোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদন করেন। ডি. পি. বড়ুয়া তাঁর ভাষণের তাৎক্ষণিক ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন। ভাষণশেষে উপস্থিত বিশ্বপ্রতিনিধিবৃন্দ সংঘরাজ শীলালঙ্কারকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান।

দুই সপ্তাহের জাপান ভ্রমণকালে সংঘরাজ শীলালঙ্কার তাঁর অপর দুই ভ্রমণসঙ্গী সহ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র কিয়েটো এবং ১৯৪৫ সালে পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা নগরী সফর করেন। এই জাপান ভ্রমণ

সংঘরাজের জীবনের এক দুর্লভ স্মৃতি। সংঘরাজের বয়স তখন ৮১ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও অশীতিপর এই ধর্মগুরু সদ্ধর্মের স্মৃতিচিহ্নবিজড়িত কিংবা উল্লেখযোগ্য ধর্মস্থানসমূহ ভ্রমণে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। এইসব ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনে নানা দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

অশীতিপর জীবন

১৯৮২ সালে সংঘরাজ শীলালঙ্কার ভারতে তীর্থভ্রমণে গমন করে চট্টলার কৃতিসন্তান ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধগয়াস্থ আন্তর্জাতিক ধ্যান কেন্দ্রে (International Meditation Centre) এবং কল্যাণমিত্র সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্ববিদ্যাপীঠ ভাবনাকেন্দ্রে' বহুদিন ধ্যানানুশীলন করেন।

১৯৮৪ সালে ঘাটচেক ধর্মামৃত বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর প্রদান করেন মহামান্য সংঘরাজ মহথেরো এবং ভারতের সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শাসন সেবক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-মহাসচিব ডা. সিতাংশু বিমল বড়ুয়া। এ সংস্থাটির মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহারে আয়োজিত জাতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহথেরো। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংঘরাজ শীলালঙ্কার এ অনুষ্ঠানে একটি মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন, যা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অবস্থা, অবস্থান ও ঐতিহ্য-ইতিহাস বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে।

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং মায়ানমার সরকারের অনুমোদনে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মায়ানমার সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মিঃ হুলা মিন টু'র ব্যবস্থাপনায় ১৮ সদস্যের এক বৌদ্ধ প্রতিনিধিদল ১৪ দিন ধরে মায়ানমার সফর করেন। সংঘরাজ শীলালঙ্কার ছিলেন এ প্রতিনিধিদলের নেতা।

১৯৯৭ সালে সংঘরাজ শীলালঙ্কারের নেতৃত্বে বাঙালি বৌদ্ধদের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উক্ত সাক্ষাৎকারকালে বাঙালি বৌদ্ধদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংঘরাজ শীলালঙ্কার এই সময়ে মেরুল বাড্ডাস্থ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করছিলেন।

১৯৯৮ সালে সিঙ্গাপুরস্থ মহাকরুণা বুড্ডিস্ট সোসাইটির সচিব ড. কে গুণরতন থেরোর নেতৃত্বে এবং মাইকেল কোহ-এর দানে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট হলে এক মহাসংঘদানের আয়োজন করা হয়। এতে দেড় সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত হয়ে দান গ্রহণ করেন। এ বিরাট মহাদানযজ্ঞের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শতাব্দীপ্রাচীন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকাগণ। এ মহান পুণ্যানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহথেরো।

১৯৯৯ সালে সংঘরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ানমার সরকার তাঁকে 'অগ্‌গমহাসদ্ধম্ম জ্যোতিকাধ্বজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৯৯ সালের ২৪ জুন চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন জোবরা গ্রামের সন্নিকটে 'বিশ্বশান্তি প্যাগোডা' নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার ও পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির। এ মহতী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম, বাংলাদেশ সরকারের বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া এবং মহান ভিক্ষুসংঘ ও বহু সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর এক মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল সংঘরাজ শীলালঙ্কারের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মাহমুনি পাহাড়তলী গ্রামের হাঞ্চার ঘোনায় পুণ্যপুরুষ সংঘরাজ সারমেধ কর্তৃক সর্বপ্রথম সাতজন রাউলী পুরোহিতকে বিনয় বিধান মতে পুনঃউপসম্পদা প্রদানের স্মৃতিধন্য স্থানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণকল্পে ঐদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো। এ পুণ্যানুষ্ঠানে শত শত ভিক্ষুসংঘ এবং দায়কসংঘ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসবে সংঘরাজ শীলালঙ্কার সভাপতিরূপে শেষ আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন। এ পুণ্যানুষ্ঠানে তাঁকে চীবর প্রদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান

অতিথি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং বিশেষ অতিথি চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এ. বি. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী।

২০০০ সালের ১২ মার্চ 'বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা' সংঘরাজ শীলালঙ্কারকে 'অগ্‌গমহাপণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করেন। উপসংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে এবং ভিক্ষুসভার সদস্যবর্গের উপস্থিতিতে মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে আনুষ্ঠানিকভাবে এ উপাধি প্রদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মহাপ্রয়াণ

২০০০ সালের ২৩ মার্চ বিকেল ২টা ০৫ মিনিটে মহামান্য সংঘরাজ তাঁর সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসরের সাধনভূমি মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে অগণিত ভিক্ষুসংঘ এবং বহু সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকার উপস্থিতিতে মহাপ্রয়াণ করেন। উক্ত দিবস তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু হরতালের কারণে সংঘরাজের মরণোত্তর শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় ২৬ মার্চ তারিখে। সংঘরাজ শীলালঙ্কারের মহাপ্রয়াণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর প্রতিদিন অগণিত সদ্ধর্মপ্রাণ নরনারী শান্তিধাম বিহারে এসে তাঁর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকেন। এক শতাব্দীকালের সময়পটে জীবনধারণ এবং সদ্ধর্মের প্রচারে-প্রসারে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে ধর্মদান করে সংঘরাজ শীলালঙ্কার বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি প্রণম্য, অনুসরণীয়, ধর্মাত্মা মহাপুরুষ।

সংঘরাজ শীলালঙ্কারের মহাপ্রয়াণ দিবসে শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথেরো শান্তিধাম বিহারে গমন করে সংঘরাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> জীবনের সর্বশেষ পরিণত বয়সের নাম অথর্বকাল। মাহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় অথর্বকালে উপনীত হয়েও রোগ বা বার্ধক্যাদি কারণে অচল অক্ষম সামর্থহীন হন নি। কদাচিৎ তাঁকে ধরে বসাতে, ধরে উঠাতে, ধরে ধরে চালাতে হত। সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর তিনি দুরারোগ্য কোনোরকম ব্যাধিগ্রস্ত হন নি। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনোরকম বৈকল্য ঘটতে দেখতে পাই নি। পূর্ণ যৌবনে যেরূপ ছিল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তেমনি ছিল। অত্যধিক বয়সের আধিক্য হেতু কখনও শারীরিক দৌর্বল্য অনুভব করতেন।

তথাপি এই অথর্ব কালেও দেশের সমাজের ধর্মানুষ্ঠানে গমনাগমনে পরাঙ্মুখ হন নি। হাস্যবদনে সর্বত্র গমন করেছেন। তাঁর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম অনাবিল ছিল। মৃত্যুর ২/৩ ঘণ্টা পূর্বে শুমানমর্দ্দনে যাওয়ার সময় আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তখন কিন্তু মৃত্যুর ভয়ানক তাড়না তাঁর সর্বাঙ্গে উপস্থিত। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–'ইবা কন' ? আমি জোর গলায় যখন বলে উঠলাম—আমি জ্যোতিঃপাল। মরণ বা মরণতুল্য যন্ত্রণা উপেক্ষা করে কন্দর্পবিনিন্দিত দীপ্তিমান বদনে কিঞ্চিৎ হেসে উঠলেন। মুখমণ্ডলে হাস্যময় জ্যোতি ভেসে উঠলো। অদ্যাবধি তা আমার প্রাণে লেগে আছে। তা আজীবন অপরিহার্য্য থেকে যাবে। ইহাই আমার প্রতি তাঁর চরম আশীর্বাদ।

সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহথেরোর জীবনপঞ্জি

১৯৯০ ২১ জুন শুক্রবার চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন নানুপুর গ্রামে জন্ম। গৃহীনাম সহদেব। সদ্ধর্মপ্রাণ পিতা জয়ধন বড়ুয়া ও পুণ্যশীলা মাতা শ্যামাবতী বড়ুয়া।

১৯০৬ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু।

১৯০৮ মাতৃবিয়োগ।

১৯১৩ চট্টগ্রাম শহরের জে. এম. সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি।

১৯১৯ অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সাক্ষাৎলাভে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনের প্রবল প্রতীতি জন্মে।

১৯২১ জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে আকিয়াব যাত্রা ও সেখানে অরণ্য বিহারে অবস্থান। ২১ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) তারিখে আরাকানী ভিক্ষু পণ্ডিত উ সুমঙ্গলের নিকট প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষা, নভেম্বর মাসে মহাসংঘদান অনুষ্ঠানের পর সোয়েজাদি বিহার সীমায় অধ্যক্ষ উ তেজরাম মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা গ্রহণ ও দু'মাস পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৯২৩ ২৪ জানুয়ারি বুধবার ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার্থে শ্রীলংকা গমন, ১৩ মার্চ শ্রীলংকার পানাদুরে সদ্ধর্মোদয় পরিবেণে মহাপণ্ডিত উপসেন মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে ১২ জন পণ্ডিত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে

দ্বিতীয়বার কর্মবাক্য শ্রবণ ও ১৪ মার্চ পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসব্রত গ্রহণ।

১৯২৪ ২৪ নভেম্বর পণ্ডিত ধর্মদর্শী মহাস্থবিরের নিকট শাস্ত্রশিক্ষা শুরু।

১৯২৫ ৫ জুন তারিখে শ্রীলংকার প্রখ্যাত সুবর্ণমালী মহাচৈত্য দর্শনে অনুরাধাপুর যাত্রা।

১৯২৭ জানুয়ারি মাসে জন্ম-জনপদ নানুপুরে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭-৩০ জন্ম-জনপদে অবস্থান এবং ধর্মশিক্ষার জন্য 'জ্ঞানোদয় লাইব্রেরী' স্থাপন।

১৯৩০ গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহ্বানে কলিকাতা ধর্মাংকুর বিহারের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ এবং সেখানে 'সদ্ধর্মসভার' প্রবর্তন।

১৯৩১ সারনাথ মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। কলিকাতায় তিন বছর অবস্থানকালীন সময়ে "বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি"ও "বৌদ্ধ অনুশীলন সমাজ" ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সাংগঠনিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ।

১৯৩৩ ১৮ মার্চে গুরুদেপ্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহ্বানে রেঙ্গুন গমন। ১৯২৮ খিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস" এবং "সংঘশক্তি" পত্রিকার দায়িত্বভার ও বিহারাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ।

১৯৩৬ অসুস্থতার জন্য স্বদেশে ফিরে আনন্দধাম বিহারে বর্ষাব্রত পালন।

১৯৩৭ ২০ ডিসেম্বর পুনরায় রেঙ্গুন গিয়ে পূর্বের দায়িত্বভার গ্রহণ।

১৯৪১ ২১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন ত্যাগ। বোমার আঘাতে বৌদ্ধ মিশন প্রেস ধ্বংস। নিজ জন্মস্থানের বিহারে ৫ বছরকাল অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন।

১৯৪৩ দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামে সরকারি সাহায্য বিতরণে যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন।

১৯৪৬ ৩ জুলাই বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ।

১৯৬৪ ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার ভদন্ত জ্ঞানশ্রী স্থবির সহ "ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড" প্রতিষ্ঠা করেন এবং বোর্ড হতে বহু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৬৬ বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক "সাহিত্যরত্ন" উপাধি প্রদান।

১৯৬৭ ১৪ জুন "মির্জাপুর শান্তিধাম বিহার"-এর অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ।

১৯৬৯ বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে "বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা" শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান। উক্ত সভায় ভিক্ষু মহাসভার সহ-সভাপতি ও অনুনায়ক পদে নির্বাচিত।

১৯৭০ ৯ মার্চ মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে "মূলগন্ধকুটি" নামক সুরম্য চৈত্য প্রতিষ্ঠা।

১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী মানুষের জীবন রক্ষার জন্য উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন।

১৯৭৪ ৩১ ডিসেম্বর থাইল্যান্ড সরকারের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার তৎকালীন সম্পাদক প্রয়াত শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবিরসহ থাইল্যান্ড সফর। উল্লেখ্য যে মির্জাপুর গৌতম আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের পবিত্র বুদ্ধধাতু ব্যাংককের ওয়াট ধর্মমংগলে সংরক্ষণ করার জন্য সেখানে মাননীয় ফরা জ্ঞানবীরিয় মহাস্থবিরকে প্রদান এবং বিপুল সংবর্ধনা লাভ।

১৯৭৫ ২৬ ফেব্রুয়ারি "বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা" কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মানিত পদ "সংঘরাজ" এবং "মহাসভার সভাপতি" পদে বরিত হন।

১৯৭৮ ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর প্রথম পুস্তক প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে তাঁদের শুভ যাত্রায় আশীর্বাদ প্রদান।

১৯৭৯ ২৩ ফেব্রুয়ারি শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি পরিচালিত বাংলাদেশের বৌদ্ধদের জাতীয় কেন্দ্রীয় বিহার চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত পবিত্র বুদ্ধকেশধাতু প্রদান উপলক্ষে থাইল্যান্ড গমন। মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি মহাসম্মেলনে যোগদান। সেখানে মঙ্গোলিয়ার সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু মহামান্য খাম্বোলামা গাম্বোজেব, নোবেল বিজয়ী মহামান্য দালাই লামা এবং জাপানি বৌদ্ধ নেতা নিচিদাৎসু ফুজি গুরুজী প্রমুখ বৌদ্ধ ব্যক্তিত্বের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ। ৩০ ডিসেম্বর কুমিল্লাস্থ বরইগাঁওয়ে বিশ্বনাগরিক পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের মহোদয়ের আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে যোগদান।

১৯৭৯ ১৬ মার্চ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দির মিলনায়তনে পালি বুক সোসাইটি কর্তৃক তিনদিন ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রদর্শনী উদ্বোধন ও সোসাইটির কর্মীদের উৎসাহ প্রদান।

১৯৮১ মহামান্য সংঘরাজ নিচিরেন মহাবোধিসত্ত্বের ৭০০তম জন্ম-বার্ষিকীতে যোগদান ও একক বক্তৃতা প্রদান। ৮ মার্চ শান্তিধাম বিহারে সংঘরাজের হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন।

১৯৮২ বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাচীনতম জাতীয় সংগঠন শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি কর্তৃক মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাথেরোকে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ঘোষণা প্রদান। এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ শাখার সভাপতি নির্বাচিত। বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রে ও সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী প্রতিষ্ঠিত "বিশ্ব বিদ্যাপীঠ" ভাবনা কেন্দ্রে ধ্যানানুশীলন ও বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনা লাভ এবং রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের অধ্যক্ষ সাধক ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবিরের আহ্বানে একসাথে বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান।

১৯৮৪ ঘাটচেক ধর্মামৃত বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির)। শ্রীলংকা থেকে

প্রকাশিত *The World Buddhist Directory* এ সংঘরাজের জীবনপঞ্জি প্রকাশ।

১৯৮৮ "শাসন সেবক সংঘ" প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৯৩ ২৮ মে ঐতিহাসিক জে. এম. সেন হলে সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের সংক্ষুব্ধ এবং সংঘাত পরিস্থিতির অবসানকল্পে একই সাথে সমাজের সর্বস্তরে মৈত্রীময় বাতাবরণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিক সংহতি সমাবেশে সভাপতিত্ব।

১৯৯৪ ঢাকা "আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে" অনুষ্ঠিত জাতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলেনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ প্রদান।

১৯৯৫ ৮ জন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে মায়ানমার গমন ও প্রাণঢালা সংবর্ধনা লাভ।

১৯৯৬ মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে অনুষ্ঠিত "প্রজ্ঞালোক জিনবংশ কল্যাণ ট্রাস্টের" বার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিত সুগতবংশ মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে সংঘরাজকে "প্রজ্ঞালোক-জিনবংশ" স্বর্ণপদক প্রদান।

১৯৯৭ ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পৃথক পৃথক আলাচনায় বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

১৯৯৮ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি এবং সিঙ্গাপুরস্থ মহাকরুণা বুড্ডিষ্ট সোসাইটির যৌথ আয়োজনে চট্টগ্রাম শহরের ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট হলে এক অবিস্মরণীয় বৌদ্ধ সমাবেশ এবং মহাসংঘদান ও চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়। এই অবিস্মরণীয় সমাবেশে প্রায় দুই সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাথেরো। উল্লেখ্য যে, সমাবেশের পূর্বাহ্নে

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার থেকে মহামান্য সংঘরাজকে রাজছত্র শোভিত করে এবং পুরোভাগে রেখে এক ঐতিহাসিক শান্তি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই শান্তি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মৌলানা নূরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির চেয়ারম্যান ও বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় বৌদ্ধ নেতা বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া, সিঙ্গাপুরস্থ মহাকরুণা বুড্ডিস্ট সোসাইটির সচিব ডঃ কে গুণ রত্না থেরো। শান্তি শোভাযাত্রায় আরো অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি এবং সিঙ্গাপুরস্থ মহাকরুণা বুড্ডিস্ট সোসাইটির নেতৃবৃন্দ।

১৯৯৯ মাননীয় সংঘরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মায়ানমার সরকার কর্তৃক "অগ্‌গ মহাসদ্ধম্ম জ্যোতিকাধ্বজ" উপাধি প্রদান। ২৪ জুন বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিশ্বনাগরিক পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সাথে মাননীয় সংঘরাজ উপস্থিত থাকেন। ২৬ অক্টোবর সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমি পাহাড়তলীতে "স্মৃতিসৌধ"-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে চীবর দান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও বিশেষ অতিথি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরীর উপস্থিতিতে সভাপতি হিসেবে শেষ আশীর্বাদ জ্ঞাপন।

২০০০ ১২ মার্চ বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক উপসংঘরাজ পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সভাপতিত্বে মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে অগ্‌গ মহাপণ্ডিত উপাধি প্রদান। ২৩ মার্চ বিকাল ২টা ০৫ মিনিটে শতাব্দীর বৌদ্ধ মনীষা মহামান্য সংঘরাজের মহাপ্রয়াণ। ২৬ মার্চ পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উদ্যোগে জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. *রাহুল চরিত*। প্রথম প্রকাশ ১৯৩গ। পৃষ্ঠা ১০৪। পরিচ্ছেদ ১২। বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, বার্মা (মায়ানমার)।

২. *অজাতশত্রু*। প্রথম প্রকাশ ১৯৩২। পৃষ্ঠা ১৫০। পরিচ্ছেদ ২০।

৩. *বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ নারী*। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩। পৃষ্ঠা ১৪১।

৪. *পারাজিকা*। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭। পৃষ্ঠা ৪৩৩। ৪টি বর্গে বিভক্ত।

৫. *বিমানবত্থু*। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮। পৃষ্ঠা ৩৬৬। ৭টি বর্গে বিভক্ত।

৬. *ধর্মপদার্থ কথা*। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩। পৃষ্ঠা ৩০৮। বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, বার্মা (মায়ানমার)।

৭. *জীবক*। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪। পৃষ্ঠা ৯১। ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড, চট্টগ্রাম।

৮. *বৌদ্ধ নীতি মঞ্জরী*। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫। পৃষ্ঠা ৮২। ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড, চট্টগ্রাম।

৯. *আনন্দ*। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭। পৃষ্ঠা ২৫৬। পরিচ্ছেদ ৬। ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড, চট্টগ্রাম।

১০. *জাতকাবলী*। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮।

১১. *বিশাখা*। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১। পৃষ্ঠা ১০৪।